ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

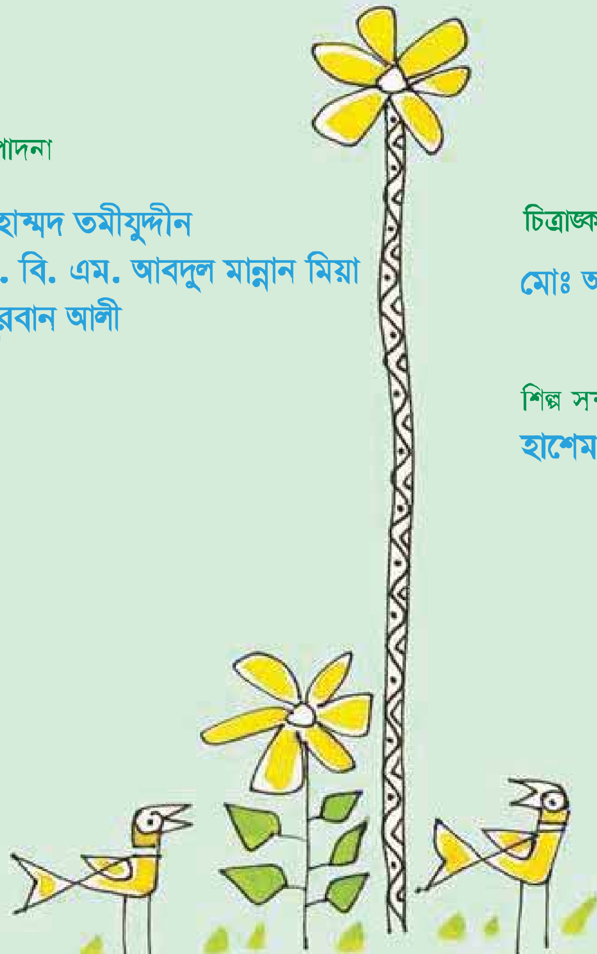

রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন
অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া
মুহাম্মাদ কুরবান আলী

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আরিফুল ইসলাম

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৫

সমন্বয়ক
মোঃ মোসলে উদ্দিন সরকার

গ্রাফিক্স
ফারহানা আক্তার দোলন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনর্নির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক বিষয়ে সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে যে সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে হবে, তার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা। কেননা, এই বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে এবং শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে, যাতে সমাজের সব ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়। এদিকে দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে এই ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজ চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে, তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ – বিশ্বাস

আকাইদ – বিশ্বাস	পৃষ্ঠা
আল্লাহ তায়ালার পরিচয়	০১
আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি	০৪
আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা	০৪
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল	০৮
আল্লাহ অতি সহনশীল	০৮
আল্লাহ সর্বশ্রোতা, আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা, আল্লাহ সর্বশক্তিমান	০৯
নবি–রাসুলের পরিচয়	১০
আখিরাতের প্রতি ইমান	১২
কবরে সওয়াল–জওয়াব	১৩
কবরে আরাম অথবা আজাব	১৪
কিয়ামত, হাশর, মিযান, জান্নাত–জাহান্নাম	১৫
আখিরাত বিশ্বাসের নৈতিক উপকার	১৬
একজন মুসলিমের চরিত্র	১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত

ইবাদত	২২
পাক–পবিত্রতা	২৪
সালাত	২৪
সালাতের সময়	২৬
সালাত আদায়ের নিয়ম	২৯
সালাতের আহকাম, আরকান	৩৫
সালাতের ওয়াজিব	৩৭
মসজিদের আদব	৩৮
সাওম	৪০
যাকাত	৪৩
হজ	৪৫
কুরবানি	৪৮
আকিকা	৫১
ব্যবহারিক দোয়া	৫২
পরিচ্ছন্নতা	৫৪
সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া	৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ

আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের একটি আদর্শ কাহিনী	৬৪
সৃষ্টির সেবা	৬৫
দেশপ্রেম	৬৮
ক্ষমা	৭০
ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া	৭২
সততা	৭৪
পিতা–মাতার খেদমত	৭৬
শ্রমের মর্যাদা	৭৮
মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব	৮১
পরিবেশ	৮৩
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৮৪

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদের পরিচয়	৯১
তাজবিদ, মাখরাজ	৯২
ওয়াক্ফ বা বিরাম চিহ্ন	৯৫
গুন্নাহ	৯৬
সূরা ফিল	৯৭
সূরা কুরাইশ	৯৮
সূরা মাউন	৯৯
সূরা কাউসার	১০০
সূরা কাফিরুন	১০১

পঞ্চম অধ্যায়

মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়

মহানবি (স)-এর জন্ম ও পরিচয়	১০৫
শৈশব ও কৈশোর	১০৬
হাজরে আসওয়াদ স্থাপন	১০৭
হযরত খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহ	১০৮
নবুয়ত লাভ	১০৯
ইমানের দাওয়াত	১১০
ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন	১১১
মিরাজে গমন	১১২
মদিনায় হিজরত	১১৩
আল্লাহর ওপর মহানবি (স)-এর ছিল গভীর আস্থা, অটল বিশ্বাস	১১৪
মদিনার সনদ	১১৪
বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ	১১৫
হুদায়বিয়ার সন্ধি	১১৭
মক্কা বিজয়	১১৮
বিদায় হজ	১১৯
কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি–রাসুলগণের নাম	১২১
হযরত আদম (আ)	১২১
হযরত নূহ (আ)	১২৩
হযরত ইবরাহীম (আ)	১২৬
হযরত দাউদ (আ)	১২৯
হযরত সুলায়মান (আ)	১৩০
হযরত ঈসা (আ)	১৩১

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ اَلْعَقَائِدُ বিশ্বাস

আল্লাহ তায়ালার পরিচয়

আমরা জানি, কাঠমিস্ত্রি কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, খাটসহ আরও অনেক কিছু তৈরি করে। রাজমিস্ত্রি ইটের ওপর ইট সাজিয়ে দালানকোঠা তৈরি করে। বড় বড় ইমারত তৈরি করে। এসব কোনো কিছুই নিজে নিজে তৈরি হয় না। কেউ সৃষ্টি না করলে কোনো কিছুই সৃষ্টি হয় না।

আমাদের মাথার ওপর সুন্দর সুনীল আকাশ, মিটিমিটি তারা, গ্রহ-উপগ্রহ, পৃথিবী থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় প্রখর সূর্য নিজে নিজেই কি সৃষ্টি হয়ে গেছে? না, সবকিছুরই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি কে? তিনি মহান আল্লাহ।

সবার আগে আমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা। কেননা মহান আল্লাহ আছেন এ সম্পর্কে যদি আমাদের পূর্ণ ইমান না থাকে তা হলে কী করে আল্লাহর আদেশ মতো চলব? এর সাথে সাথে প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে জানা। আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন- এর ওপর আমাদের দৃঢ় ইমান থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান না থাকলে ইসলামের সরল সহজ পথে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এরপর আমাদের জানতে হবে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করার সঠিক পথ কোনটি। কী কী কাজ আল্লাহ পছন্দ করেন, যা আমরা করব? আর কোন কোন কাজ অপছন্দ করেন; যা থেকে আমরা দূরে থাকব। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহর আইন ও বিধানের

জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য ফরজ। আল্লাহর বিধান আছে কুরআন মজিদে। কুরআন মজিদ আমাদের পড়তে হবে ও বুঝতে হবে। আল্লাহর আদেশগুলো পালন করতে হবে। নিষেধ থেকে দূরে থাকতে হবে।

আমাদেরকে আরও জানতে হবে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী পথে চলার পরিণাম কি? আর তাঁর আদেশ মেনে চলার পুরস্কারই বা কী? এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে কবর, কিয়ামত, হাশর, মিযান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানা ও ইমান থাকা অপরিহার্য। এ আলোচনায় যেসব বিষয় জানতে ও বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, তারই নাম হচ্ছে ইমান। ইমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন। যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্ব, তাঁর গুণাবলি, তাঁর বিধান এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে জানে এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে তাকে বলা হয় মুমিন। আর ইমানের ফল হলো মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রাকৃতিক দৃশ্য

দলীয় কাজ : আল্লাহর পরিচয় জানার জন্য যেসব বিষয়ের জ্ঞান থাকা জরুরি শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে সেসব বিষয়ের একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে বড় বড় করে লিখবে।

আমরা জানলাম আনুগত্যের জন্য ইমানের প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর গুণাবলি,

তাঁর দেওয়া বিধান ও আখিরাতের জীবন সম্পর্কে আমরা কীভাবে জানব?

আমাদের চারদিকেই ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য সৃষ্টি, যা তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন। এসব নিদর্শন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সবকিছুই একই স্রষ্টার সৃষ্টি।

কতো সুন্দর আমাদের এই দেশ। কতো সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী। সবুজ ফসলের মাঠ। মাঠভরা সোনালি ধান। বন, বাগান, গাছ–গাছালি। কুল কুল শব্দে বয়ে যায় নদী। ওপরে নীল আকাশ। রাতে তারা ঝলমল করে। কোনো সময় শীত। কোনো সময় গরম। কোনো সময় ঝরে বৃষ্টি। এ সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। এসব নিদর্শনের ভেতরে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় গুণের প্রকাশ। তাঁর হেকমত, তাঁর জ্ঞান, তাঁর কুদরত, তাঁর দয়া, তাঁর লালন–পালন, এক কথায় তাঁর সব গুণের পরিচয়। এসব নিদর্শন আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এসব সৃষ্টি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সবকিছুই একই স্রষ্টার সৃষ্টি।

এছাড়া আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানি করে মানুষেরই মধ্য থেকে এমন সব মহামানব সৃষ্টি করেছেন, যাঁদের তিনি দিয়েছেন নিজের গুণাবলি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান। মানুষ যাতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে, তার নিয়মই তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আখিরাতের জীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দিয়েছেন। এরপর তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন অপর মানুষের নিকট এসব পৌঁছে দিতে। এঁরাই হচ্ছেন আল্লাহর নবি–রাসুল। তাঁদের জ্ঞানদানের জন্য আল্লাহ যে মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, তার নাম হচ্ছে ওহি। আর যে কিতাবে তাঁদের এ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয় আল্লাহর কিতাব। কুরআন মজিদ আল্লাহর কিতাব।

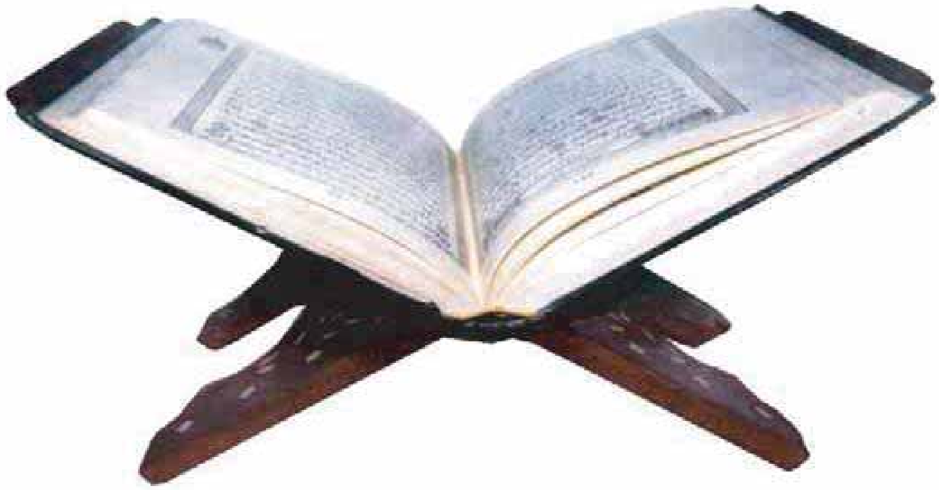

ছবি: আল কুরআন

কাজ : আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর দশটি সৃষ্টির একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা তৈরি করে পোস্টার পেপারে মার্কার দিয়ে লিখবে।

আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি

মহান আল্লাহ তায়ালার অনেকগুলো সুন্দর নাম আছে এগুলোকে আসমাউল হুসনা বলে। আল্লাহ তায়ালার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারলে চরিত্র ভালো হয়। ভালো মানুষ হওয়া যায়। যেমন আল্লাহ দয়ালু। তিনি সবাইকে দয়া করেন। আমরাও সবাইকে দয়া করব। আল্লাহ 'রব'। তিনি সকল সৃষ্টিকে লালনপালন করেন। আমরাও তাঁর সৃষ্টিকে যথাসাধ্য লালনপালন করব। আল্লাহ 'রাজ্জাক'। তিনি সবার খাদ্য দেন। আমরাও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব। তাই ইসলামে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ –

অর্থ : তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।

আল্লাহর গুণ সম্পর্কে জানা থাকলে আল্লাহর আদেশমতো চলা সহজ হয়। অন্যায় থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

আল্লাহ সবকিছু দেখেন
সব কথা শোনেন,
সবকিছুর খবর রাখেন।

এ কথাগুলো জানা থাকলে এবং এ কথাগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে কারও পক্ষে অন্যায় করা সম্ভব নয়। ঠিকভাবে সে আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে পারে।

কুরআন মজিদে মহান আল্লাহর অনেক গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো থেকে কয়েকটি গুণের কথা আমরা জানব।

আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা

আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম। এই আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে জানা ও ইমান আনা। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে পূর্বের পাঠে আমরা জেনেছি। এখন আমরা আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে জানব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব। আমাদের পালনকর্তা। আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবকিছু লালনপালন করেন। গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, সবারই খাদ্যের প্রয়োজন

গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়–পর্বত, বাড়িঘরসহ প্রাকৃতিক দৃশ্য

হয়। লালনপালনের দরকার পড়ে। সবার খাদ্য এক রকম নয়। আমরা ভাত, মাছ, গোশত, ফলমূল খাই। পশুপাখি খায় ঘাস ও পোকামাকড় ইত্যাদি। কিন্তু গাছপালা এসব কিছু খেতে পারে না। গাছপালার মুখ নেই। তারা মাটি থেকে শিকড় দিয়ে পানি শুষে নেয়। আর বাতাস থেকে নেয় কার্বন–ডাই–অক্সাইড। এ দিয়ে তারা খাদ্য তৈরি করে।

আমরা সব সময় শ্বাস নিই এবং শ্বাস ফেলি। শ্বাস–প্রশ্বাস ছাড়া কোনো জীব বাঁচে না। শ্বাস ফেলার সময় এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বের হয়। এই বায়ুর নাম কার্বন–ডাই–অক্সাইড। গাছ এই বায়ু গ্রহণ করে খাদ্য তৈরির উপাদান হিসেবে। আর আমাদের জন্য ছাড়ে অক্সিজেন। শ্বাস নেওয়ার সময় আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি। অক্সিজেন ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না। এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় আল্লাহর মহিমা কতো বড়। আমাদের জন্য যা বিষ, গাছপালার জন্য তা খাদ্য তৈরির উপাদান। গাছপালার মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন পাই, ফলমূল ও খাদ্য পাই। কতোভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের লালনপালন করেন।

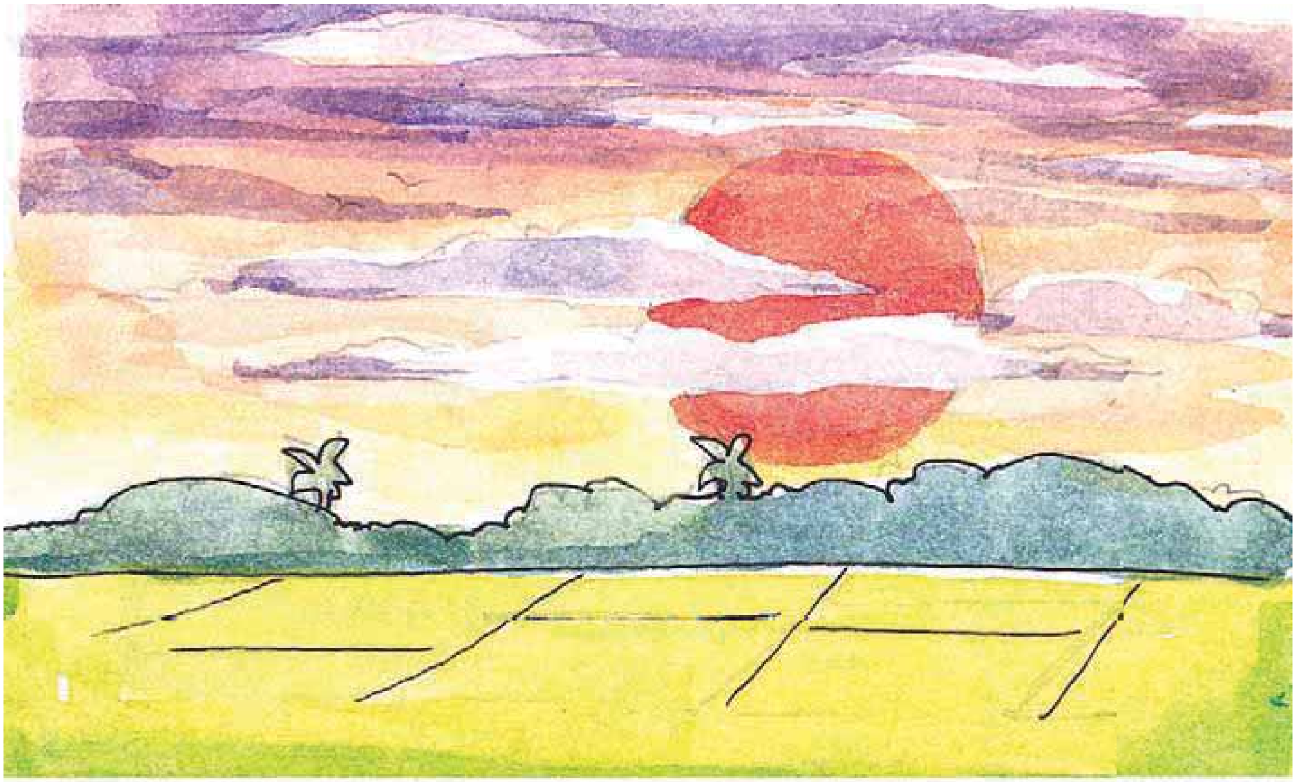

সূর্যোদয়ের দৃশ্য

আমরা জানি, পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। পানি ছাড়া গাছপালাও বাঁচে না। প্রতিদিন আমাদের প্রচুর পানি ব্যবহার করতে হয়। এ পানি আমরা কোথা থেকে পাই?

প্রতিদিন সূর্যের তাপে নদীনালা, খালবিল ও সাগরের পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এই জলীয় বাষ্প বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পরে ঠান্ডা হলে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। এই পানির কিছু অংশ মাটির নিচে জমা হয় আর কিছু অংশ পুকুর, নদীনালা, খালবিল ও সাগরে গিয়ে পড়ে।

মাটির নিচে জমা পানি কূপ ও নলকূপের মাধ্যমে আমরা পাই। এ পানি বিশুদ্ধ পানি। বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। নদনদী, খালবিল এবং পুকুরের পানিও আমরা ব্যবহার করি। এসবের পানি যাতে বিশুদ্ধ থাকে, আমরা সেদিকে খেয়াল রাখব।

ভাবতে অবাক লাগে, পরম করুণাময় আল্লাহ পানিচক্রের মাধ্যমে কেমন করে আমাদের প্রতিনিয়ত বিশুদ্ধ পানির জোগান দিয়ে চলেছেন। এ পানি, বৃষ্টি, নদীনালা, সাগর ও মহাসাগর সবই আল্লাহর দান।

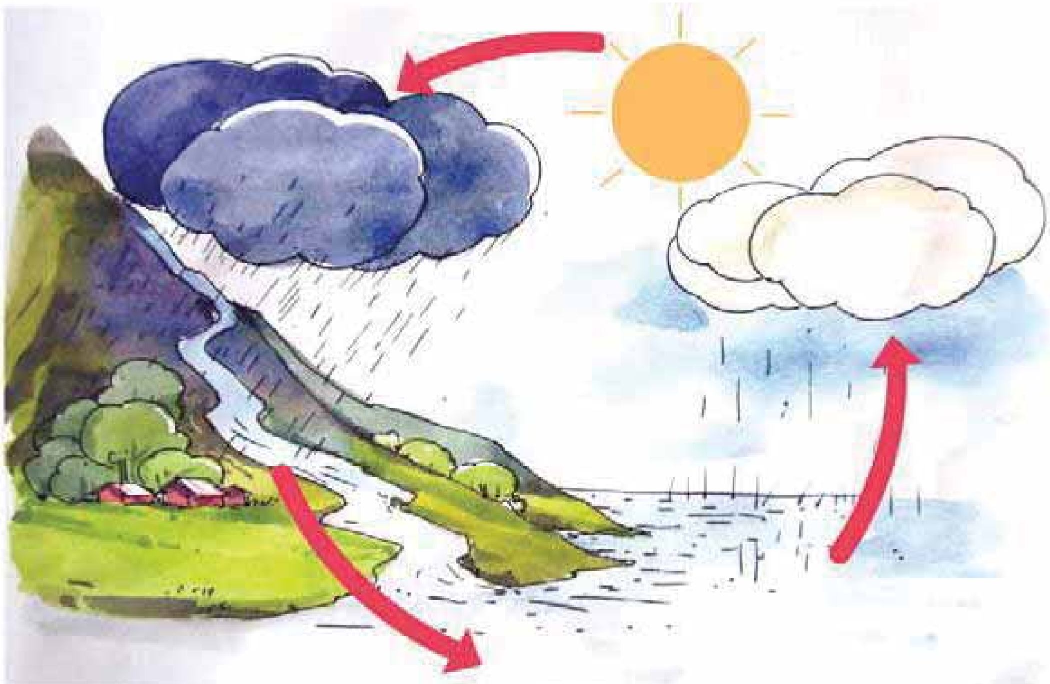

চিত্র: পানিচক্র

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? এ পানি মেঘ থেকে তোমরাই নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি?" সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ৬৮–৬৯

আলো, বাতাস, পানি সবই আল্লাহ তায়ালার দান। আল্লাহই খাদ্য দেন। ছোট থেকে বড় করেন। সবার প্রয়োজন পূরণ করেন। অসংখ্য তাঁর অনুগ্রহ। তাঁর নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যায় না। তাঁর নিয়ামত লাভ করেই আমরা বেঁচে আছি। তিনিই সারা বিশ্ব লালন-পালন করছেন। তিনিই নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা।

চন্দ্র–সূর্য, পশু–পাখি, জীব–জন্তু, আলো–বাতাস, পাহাড়–পর্বত, গাছ–পালা, সাগর–মহাসাগর, আসমান জমিন সবকিছু তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সব সৃষ্টিকে তিনি মানুষের আজ্ঞাবহ করে দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর আদেশ মতো তাঁর সব নিয়ামত ভোগ করব। আর একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করব। তাঁরই শোকর আদায় করব।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন   اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থ: সব প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি সারা বিশ্বের পালনকর্তা।

আল্লাহ আমাদের একমাত্র রব। আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ' এবং এর ওপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় বলে, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও"। (সূরা: হা-মিম সাজদাহ, আয়াত: ৩০)

কাজ: শিক্ষার্থীরা পানিচক্রের একটি ছবি আঁকবে।

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (اَللّٰهُ غَفُوْرٌ)

মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অন্যায় করে ফেলে। পাপ কর্ম করে বসে। তখন যদি সে অনুতপ্ত হয়, ভুল স্বীকার করে, পাপ কাজ থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায় তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা : যুমার, আয়াত-৫৩)

আমাদের ভুল হলে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইব। আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেবে[illegible] মরা সাবধান থাকব, যেন আর কোনো ভুল না হয়।

আল্লাহ অতি সহনশীল (اَللّٰهُ حَلِيْمٌ)

আমরা অনেক সময় অপরাধ করি। আল্লাহ আদেশ লঙ্ঘন করি। আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে শাস্তি দেন না। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের অপরাধের জন্য সাথে সাথে শাস্তি [illegible] রা কেউ বাঁচতে পারতাম না। আল্লাহ অতি সহনশীল। তিনি সহনশীলতা পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ (ওয়াল্লাহু আলীমুন হালীম)

অর্থ : আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, অতি সহনশীল। (সূরা নিসা, আয়াত-১২)

আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (اَللّٰهُ سَمِيْعٌ)

আল্লাহ সব শোনেন। আমরা প্রকাশ্যে যা বলি, তা তিনি শোনেন। গোপনে যা বলি, তা-ও তিনি শোনেন। আমরা মনে মনে যা বলি, তা-ও তিনি শোনেন। তাঁর কাছে গোপন কিছুই নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . ইন্নাল্লাহা সামীউন আলিম

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। (সূরা বাকারা, আয়াত–১৮১)

আমরা অন্যায় কিছু বলব না। কারণ আল্লাহ তায়ালা শোনেন। আমরা কাউকে গালি দেব না, কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব না। মিথ্যা কথা বলব না। ওয়াদা ভঙ্গ করব না। কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেব না। কারণ মহান আল্লাহ সব জানেন, সব শোনেন।

আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা (اَللّٰهُ بَصِيْرٌ)

আমরা অনেক কিছুই দেখি না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সবকিছু দেখেন। আমরা গোপনে যা করি, তা-ও তিনি দেখেন। প্রকাশ্যে যা করি, তা-ও তিনি দেখেন। সাগরের তলদেশে, গভীর অন্ধকারে জীবাণুর মতো ক্ষুদ্র পোকার নড়াচড়াও তিনি দেখেন। তাঁর কাছে অদৃশ্য কিছুই নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ইন্নাল্লাহা সামীউন বাসির

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন। (সূরা লোকমান, আয়াত–২৮)

আমরা কর্তব্য কাজে অবহেলা করব না। কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করব না। অন্যায় কাজ করব না। কারো ওপরে অত্যাচার করব না। কারণ মহান আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান (اَللّٰهُ قَدِيْرٌ)

আমরা জানি, আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর শক্তির অধীন। আল্লাহ তায়ালা কারো ভালো করতে চাইলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ কারো ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন।
যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন।
যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন
যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন
আর যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত জীবিকা দান করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ـ

(ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদীর)

অর্থ : নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আল ইমরান, আয়াত–২৬)

আমরা জানলাম, আল্লাহ পালনকর্তা। আমরাও সৃষ্টজীবকে লালনপালন করব।

আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল। আমরা ক্ষমা করতে শিখব। আল্লাহ অতি সহনশীল। আমরাও সহনশীল হব। ধৈর্য ধরব। আল্লাহ সব শোনেন। আমরা অন্যায় কথা কখনো বলব না। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। আমরা ইমান রাখব জীবনের সুখ–দুঃখের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ওপর।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তায়ালার সাতটি গুণবাচক নামের তালিকা তৈরি করবে।

নবি–রাসুলের পরিচয়

তাওহিদের পর ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে রিসালাত। রিসালাত অর্থ বার্তাবহন। যে ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের কাছে নিয়ে পৌঁছায়, তাকে বলা হয় বার্তাবাহক বা রাসুল। কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় যিনি আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে নিয়ে পৌঁছান এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সৎপথে পরিচালিত করেন, তাঁকে নবি বা রাসুল বলা হয়। নবি–রাসুলের কাজ বা দায়িত্বকে রিসালাত বলে।

আমরা জানি, যিনি গাড়ি তৈরি করেন তিনিই এর কলকব্জা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন। কীভাবে গাড়ি চালালে ভালো থাকবে, দুর্ঘটনা ঘটবে না, তা তিনিই ভালো জানেন। সবাই তাঁর কথামতো গাড়ি চালায়। তাঁর কথামতো না চালালে গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানুষ মারা যায়।

মানুষ, পৃথিবী ও আকাশের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনিই সবকিছুর লালনপালন করেন। তিনিই জানেন কিসে রয়েছে মানুষের মঙ্গল। কোন পথে চললে মানুষের সুখ হবে, শান্তি হবে তাও তিনি জানেন। কীভাবে জীবনযাপন করলে দুঃখ থেকে বাঁচা যায়, কষ্ট থেকে বাঁচা যায় তাও তিনি জানেন। তিনি মহাজ্ঞানী। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জ্ঞান রাখেন।

কোন পথে মানুষের কল্যাণ, কোন পথে মানুষের সুখ, কোন পথে মানুষের ভবিষ্যৎ হবে মঙ্গলময়, কোন পথে রয়েছে মানুষের ক্ষতি– এসব বিষয় আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা পাঠালেন নবি ও রাসুল।

নবি–রাসুলগণ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তাঁরা নিষ্পাপ। আল্লাহর নিকট থেকে ওহির মাধমে তাঁরা জ্ঞান লাভ করতেন। ওহি মানে আল্লাহর বাণী। হযরত জিবরাইল (আ) ওহি নবি–রাসুলগণের কাছে নিয়ে আসতেন।

নবি–রাসুলগণের জীবনের লক্ষ্য ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা। আর আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে মানুষের জীবন গঠন করা। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে, কল্যাণের পথে ডাকতে অনেক কষ্ট করেছেন। কিছুতেই তাঁরা থেমে যাননি। অবিচলভাবে কাজ করে গিয়েছেন।

নবি–রাসুলগণের মূল শিক্ষা ছিল :

১. তাওহিদ : আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই।

২. রিসালাত : আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো।

৩. দীন : আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে জানানো।

৪. আখলাক : চারিত্রিক গুণ ও ভালো ব্যবহারের নিয়ম–কানুন শিক্ষাদান।

৫. শরিয়ত : হালাল–হারাম ও জায়েজ–নাজায়েজের শিক্ষা প্রদান।

৬. আখিরাত : মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানানো।

পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকার মানুষকে এই কথাগুলো শেখানোর জন্য নবি–রাসুলগণ এসেছেন। তাঁরা ছিলেন পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ বলেন, لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ লিকুল্লি কাওমিন হাদিন

(সূরা–আর্‌রাআদ, আয়াত–৭)

অর্থ : প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক এসেছেন।

হযরত আদম (আ) থেকে আমাদের মহানবি (স) পর্যন্ত বহু নবি–রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁরা সকলেই আল্লাহর তাওহিদের কথা বলেছেন। তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন। কথায়, কাজে এবং আচার–ব্যবহারে তাঁরা ছিলেন আদর্শ ও চরিত্রবান। যারা তাঁদের আদর্শ গ্রহণ করেছে তারা নাজাত পেয়েছে। আল্লাহর রহমত লাভ করেছে। আর যারা তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাঁদের কথা মানেনি তারা হয়েছে ধ্বংস।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসেননি। আসবেনও না। এজন্য তাঁকে বলা হয় খাতামুন্নাবিয়্যীন। খাতামুন্নাবিয়্যীন অর্থ সর্বশেষ নবি।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরি করবে।

আখিরাতের প্রতি ইমান

তৃতীয় যে বিষয়ের ওপর হযরত মুহাম্মদ (স) আমাদের ইমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে আখিরাত।

প্রায় প্রতিদিনই আমরা বহু মানুষের মৃত্যুর সংবাদ শুনি। পাড়ার কেউ মারা গেলে আমরা খবর নিতে যাই। গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে এক স্থানে জড়ো হয়ে মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ি। দোয়া করি। পরে কবরে দাফন করি। পৃথিবীতে কিছুই অমর নয়। যার জন্ম আছে, তার মৃত্যুও আছে। কিন্তু মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরও এক জগৎ আছে। মৃত্যুর পরবর্তী জগৎকে বলা হয় আখিরাত। আখিরাত অর্থ পরকাল।

মায়ের পেটে শিশু যেমন বুঝতে পারে না পৃথিবী কতো বড়, কতো সুন্দর; তেমনি মৃত্যুর আগে কেউ জানে না আখিরাত কতো বিরাট এক জগৎ। আখিরাত সম্পর্কে নবি–রাসুলগণ ওহির মাধ্যমে জ্ঞান পেয়েছেন। নবিগণ ছিলেন সত্যবাদী এবং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তাঁদের কাছ থেকেই আমরা আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান পেয়েছি।

হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সব নবি–রাসুলই

বলেছেন আখিরাতের কথা। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা। মৃত্যুর পরের জীবন অনন্তকালের জীবন। সে জীবনের শেষ নেই।

আখিরাত সংক্রান্ত যে বিষয়ের ওপর ইমান আনা জরুরি তা হলো:

১. কবরে সওয়াল – জওয়াব।

২. কবরে আরাম অথবা আজাব।

৩. এক দিন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বজগৎ ও তার ভেতর সৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ দিনটির নাম হলো কিয়ামত।

৪. আবার তাদের সবাইকে দেওয়া হবে নতুন জীবন এবং তারা সবাই এসে হাজির হবে আল্লাহর সামনে। একে বলা হয় হাশর।

৫. সকল মানুষ তাদের পার্থিব জীবনে যা করেছে তার আমলনামা আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে।

৬. আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ব্যক্তির ভালোমন্দ কাজের পরিমাপ করবেন। আল্লাহর মিযানে যার সৎকর্মের পরিমাপ অসৎ কর্ম অপেক্ষা বেশি হবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে মাফ করবেন। আর যার অসৎ কর্মের পাল্লা ভারি থাকবে, আল্লাহ তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

৭. আল্লাহর কাছ থেকে যারা ক্ষমা লাভ করবে তারা জান্নাতে চলে যাবে। আর যাদের শাস্তি দেবেন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

কবরে সওয়াল– জওয়াব

সওয়াল-জওয়াব অর্থ প্রশ্ন এবং উত্তর। মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষকেই সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে। কবরে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন।

১. মান রাব্বুকা – مَنْ رَبُّكَ

তোমার রব কে?

২. মা দীনুকা مَا دِيْنُكَ

অর্থ : তোমার দীন কী?

৩. মহানবি (স) কে দেখিয়ে বলা হবে :

মান হাযার রাজুল? مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ অর্থ: এই ব্যক্তি কে?

মহানবি (স) আমাদের এগুলোর সঠিক উত্তর শিখিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো :

رَبِّيَ اللّٰهُ – রাব্বি আল্লাহ। অর্থ : আমার রব আল্লাহ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো :

دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ – দীনী আল ইসলাম। অর্থ : আমার দীন ইসলাম।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো:

هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ – হাযা রাসুলুল্লাহ। অর্থ : ইনি আল্লাহর রাসুল।

পৃথিবীতে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথামতো চলছে, তারা সবাই এ প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারবে। তারা হবে সফলকাম। কিন্তু যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথামতো চলত না, তারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। আফসোস করে বলবে, হায়! আমি তো কিছু জানি না।

কবরে আরাম অথবা আজাব

কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। পৃথিবীতে যারা পাপ কাজ থেকে বিরত রয়েছে, তারা কবরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। তাদের জন্য কবর হবে আরাম ও শান্তিময় স্থান। জান্নাতের সাথে তাদের যোগাযোগ করে দেওয়া হবে। সেখানে তারা জান্নাতের শান্তি অনুভব করবে।

আর যারা পাপী, তারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। তাদের জন্য কবর হবে আজাবের স্থান। আজাব অর্থ শাস্তি। জাহান্নামের সাথে তাদের কবরের যোগাযোগ করে দেওয়া হবে। সেখানে তারা ভীষণ আজাব ভোগ করবে। আমরা পাপ কাজ থেকে বিরত থাকব। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবেন।

কিয়ামত (اَلْقِيَامَةُ)

এমন একদিন ছিল যখন এই নিখিল বিশ্ব এবং এর কোনো কিছুই ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহান কুদরতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার মানুষের অবাধ্যতা যখন চরমে পৌঁছাবে, আল্লাহর নাম নেওয়ার মতো একটি লোকও থাকবে না, সেদিন আল্লাহ এই বিশ্বজগৎ এবং এর সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন। একেই বলে কিয়ামত। বিশ্বজগতের এরূপ পরিণতি বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন সূর্য শীতল হয়ে যাবে, চাঁদের আলো থাকবে না। গ্রহ–উপগ্রহের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে। পৃথিবী এবং এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাশর (اَلْحَشْرُ)

বিশ্বজগৎ ধ্বংস হওয়ার অনেক বছর পর আল্লাহ তায়ালা সবাইকে পাপ–পুণ্যের বিচারের জন্য পুনরায় জীবিত করবেন। সবাইকে সেদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। একে বলা হয় হাশর। এদিন আমাদের সব কথা ও কাজের হিসাব দিতে হবে। যারা মুমিন এবং যারা পৃথিবীতে ভালো কাজ করেছে তারা সেদিন আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে। তারা নিরাপদে থাকবে। আর যারা ঈমান আনেনি, ভালো কাজ করেনি, তারা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হবে। তাদের কষ্টের সীমা থাকবে না।

মিযান (اَلْمِيْزَانُ)

আমরা যা করি, যা বলি আল্লাহ সবই সংরক্ষণ করেন। আমাদের চলাফেরা, আচার–আচরণ, ভালোমন্দ, পাপ–পুণ্য সবকিছু লিখে রাখা হয়। একে বলা হয় আমলনামা। আল্লাহর হুকুমে একদল ফেরেশতা সবকিছু লিখে রাখেন। এই ফেরেশতাদের বলা হয় কেরামান কাতেবিন। হাশরের দিন আমাদের পাপ ও পুণ্যের আমলনামা ওজন করা হবে। যার দ্বারা ওজন করা হবে তাকে বলে মিযান। মিযান অর্থ পরিমাপযন্ত্র। ওজনে যাদের নেক কাজ বেশি হবে তারা হবে জান্নাতের অধিকারী। যাদের পাপ বেশি হবে তারা হবে জাহান্নামী।

জান্নাত ও জাহান্নাম

জান্নাত হলো চিরস্থায়ী সুখের স্থান। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি। আনন্দ আর আনন্দ। পৃথিবীতে যারা ছিল ঈমানদার, যারা ছিল ভালো, তারা চিরদিনের জন্য সেখানে বাস করবে। জান্নাতে আছে আরামের সব রকমের ব্যবস্থা। মন যা চাইবে সেখানে তাই পাওয়া যাবে। সেখানে আছে উত্তম খাদ্য, পানীয় এবং সুন্দর বাগান ও ফলফলাদি।

সেখানে কোনো অভাব নেই, অশান্তি নেই, কোনো দুঃখ-বেদনাও নেই।

জাহান্নাম হলো চিরস্থায়ী কষ্টের স্থান। পৃথিবীতে যারা ইমান আনেনি, ভালো কাজ করেনি, তারা সেখানে চিরদিন বাস করবে।

জাহান্নামে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সেখানে আছে ভীষণ ও ভয়ংকর শাস্তি । যেমন আগুনে পোড়ানো, সাপের দংশন, আরো নানা রকম শাস্তি ।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা আখিরাতের জীবনের স্তরগুলো উল্লেখ করে এর একটি তালিকা তৈরি করবে।

আখিরাত বিশ্বাসের নৈতিক উপকার

আখিরাত সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স) যা শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর আগেকার নবিগণও ঠিক তাই বলেছেন। আখিরাত ব্যাপারটি ভালো করে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, আখিরাতের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। যে ব্যক্তি আখিরাতের ওপরে বিশ্বাস করে না, তার পক্ষে ইসলামের পথে চলা অসম্ভব।

ইসলাম বলে : আল্লাহর পথে গরিবকে যাকাত দাও।

জবাবে সে বলে : যাকাত দিতে গেলে আমার সম্পত্তি কমে যাবে। আমার অর্থের ওপর আমি সুদ নেব।

ইসলাম বলে : সব সময় সত্য কথা বল। আর মিথ্যা থেকে বিরত থাক।

উত্তরে সে বলে : এমন সত্যকে গ্রহণ করে আমি কী করব? যাতে আমার কেবল ক্ষতিই হবে, কোনো লাভ হবে না। আর এমন মিথ্যা থেকে আমি বিরত থাকব কেন, যা আমার জন্য লাভজনক হবে, যাতে কোনো দুর্নামের ভয় পর্যন্ত নেই?

এক জনশূন্য রাস্তা অতিক্রম করতে করতে সে দেখল একটি মূল্যবান বস্তু।

ইসলাম বলে : এ তোমার সম্পদ নয়, কিছুতেই তুমি এ জিনিস গ্রহণ করতে পার না।

সে উত্তর দেয়: আপনা-আপনি যে জিনিস আসে, তা কেন ছেড়ে দেব? এখানে তো এমন

কেউ নেই, যে দেখে পুলিশকে খবর দেবে বা আদালতে সাক্ষ্য দেবে। এরপর কেন আমি কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ থেকে লাভবান হব না?

সোজা কথায় জীবনের পথে প্রত্যেক পদক্ষেপে ইসলাম তাকে এক বিশেষ পথে চলার নির্দেশ দেবে, আর সে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অনুসরণ করে চলবে। কেননা, ইসলামে প্রতিটি জিনিসের মূল্য নির্ধারিত হয় আখিরাতের ফলাফলের ওপর। কিন্তু সে ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যাপারে চিন্তা করে ইহকালের ফলাফলের ওপর।

কেন আখিরাতের ওপর ইমান ব্যতীত মানুষ মুসলমান হতে পারে না, তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল। মুসলমান হওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃতপক্ষে আখিরাতকে অস্বীকার করে মানুষ পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে চলে যায়।

একজন মুসলিমের চরিত্র

মুসলিম চরিত্রে থাকবে আল্লাহ তায়ালার ভয়। সবকিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালার-এ ধারণা নিয়ে পৃথিবীতে সে বাস করবে। সারা পৃথিবীর মানুষের দখলে যা কিছু আছে,সবই আল্লাহর দান। কোনো জিনিসের এমনকি আমার নিজের দেহের মালিকও আমি নিজে নই। সবকিছু আল্লাহ তায়ালার দেওয়া আমানত। এ আমানত থেকে খরচ করার যে স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা খরচ করাই হলো আমার কর্তব্য। একদিন আল্লাহ তায়ালা আমার কাছ থেকে এ আমানত ফেরত নেবেন। কিয়ামতেরদিন আমাকে প্রত্যেকটি জিনিসের হিসাব দিতে হবে।

এ ধারণা নিয়ে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে, তার চরিত্র হবে সুন্দর। মন্দ চিন্তা থেকে সে তার মনকে মুক্ত রাখবে। কানকে দূরে রাখবে অসৎ আলোচনা শোনা থেকে। কারোর প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া থেকে চোখকে হেফাজত করবে। মিথ্যা কথা বলা থেকে জিহ্বাকে হেফাজত করবে। হারাম জিনিস দিয়ে সে পেট ভরবে না। তার চেয়ে সে না খেয়ে থাকবে। কারোর প্রতি সে জুলুম করবে না। সে কখনো অন্যায়ের পথে তার পা চালাবে না। মিথ্যার সামনে সে তার মাথা নত করবে না। তার চরিত্রে থাকবে সততা ও মহত্ত্বের সমাবেশ। সত্য ও ন্যায়কে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় মনে করবে। জুলুম ও অন্যায়কে সে ঘৃণা করবে। এ শ্রেণির লোকই সাফল্য অর্জন করতে পারে। যার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় স্থান পায় না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সে পুরস্কার

চায় না, তার চেয়ে বড় ইমানদার আর কে? কোন শক্তি তাকে বিচ্যুত করতে পারে সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে? কোন সম্পদ ক্রয় করতে পারে তার ইমানকে?

তার চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। কারণ সে কারোর আমানত বিনষ্ট করে না। ন্যায়ের পথ থেকে সে মুখ ফেরায় না। কথা দিয়ে কথা রাখে, ভালো ব্যবহার করে। আর কেউ দেখুক আর না দেখুক, আল্লাহ তো সব কিছুই দেখছেন - এ ধারণা নিয়ে সে সবকিছুই করে ইমানদারির সাথে। এমন লোককে সবাই স্নেহ করে, সম্মান দেয়। এমনি করে পৃথিবীতে ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জীবন অতিবাহিত করে যখন সে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন তার ওপর বর্ষিত হবে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও রহমত। এ হলো মহাসাফল্য।

দলীয় কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে বসে পরস্পর আলাপ–আলোচনা করে একজন মুসলিমের চরিত্র কেমন হবে এর একটি তালিকা তৈরি করে মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লিখবে। সবচেয়ে ভালো তালিকাটি শ্রেণিকক্ষে ঝুলিয়ে রাখবে।

অনুশীলনী

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. আমাদের পালনকর্তা কে?

ক) আব্বা–আম্মা খ) আল্লাহ তায়ালা

গ) ডাক্তার ঘ) পীরমুর্শিদ ।

২. আল আসমাউল হুসনা বলা হয় কাকে?

ক) মানুষের গুণাবলিকে খ) ফেরেশতার গুণাবলিকে

গ) আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহকে ঘ) নবিগণের গুণাবলিকে ।

৩. খালিক শব্দের অর্থ কী?

ক) পালনকর্তা খ) সৃষ্টিকর্তা

গ) রিজিকদাতা ঘ) দয়ালু।

৪. বাসিরুন শব্দের অর্থ কী?

ক) সর্বশ্রোতা খ) সহনশীল

গ) সর্বশক্তিমান ঘ) সর্বদ্রষ্টা।

৫. সামীউন শব্দের অর্থ কী?

ক) সব শোনেন খ) সব জানেন

গ) সব দেখেন ঘ) অতিসহনশীল।

৬. সর্বশেষ নবির নাম কী?

ক) হযরত ইউসুফ (আ) খ) হযরত ঈসা

গ) হযরত মুহাম্মদ (স) ঘ) হযরত মুসা (আ)।

৭. কাদীরুন শব্দের অর্থ কী?

ক) সর্বশক্তিমান　　খ) সর্বশ্রোতা

গ) সর্বদ্রষ্টা　　ঘ) সৃষ্টিকর্তা।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. আনুগত্যের জন্য .... প্রয়োজন।

২. আল্লাহ তায়ালার গুণে .... গুণান্বিত করতে হবে।

৩. আল্লাহ তায়ালা আমাদের ....।

৪. আমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ....করব।

৫. আমরা কথা দিয়ে কথা ....।

গ. ডান পাশের সঠিক শব্দগুলো দিয়ে বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে মিল কর।

	ডান	বাম
১.	গাফুরুন অর্থ	অতিসহনশীল
২.	হালিমুন অর্থ	অতিক্ষমাশীল
৩.	রাসুল অর্থ	চিরস্থায়ী সুখের স্থান
৪.	জান্নাত হলো	চিরস্থায়ী কষ্টের স্থান
৫.	জাহান্নাম অর্থ	বার্তাবাহক

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন:

১. ইমান শব্দের অর্থ কী?

২. সারা বিশ্বের পালনকর্তা কে?

৩. আমাদের দীনের নাম কী?

৪. আমরা কী বলে আল্লাহর শোকর আদায় করব?

৫. আখিরাত মানে কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জানা ও ইমান আনার জন্য আমাদের কী কী জানা জরুরি?

২. মুমিন কাকে বলে? ইমানের ফল কী?

৩. সারা বিশ্বের পালনকর্তা কে? তাঁর লালনপালনের একটি বর্ণনা দাও।

৪. আল্লাহ তায়ালার ৫টি গুণের নাম বাংলা অর্থসহ আরবিতে লেখ।

৫. আল্লাহ ক্ষমাশীল তা বুঝিয়ে লেখ।

৬. নবি–রাসুলগণের শিক্ষার মূল কথাগুলো কী কী?

৭. আখিরাত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কী কী?

৮. একজন মুসলিমের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত–এ সম্পর্কে ১০টি বাক্য লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদত (اَلْعِبَادَةُ)

'ইবাদত' শব্দের অর্থ আনুগত্য, দাসত্ব, বন্দেগি ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর যাবতীয় আদেশ, নিষেধ মেনে চলাকে বলে ইবাদত। আল্লাহ আমাদের 'ইলাহ'। ইলাহ মানে মাবুদ। আর আমরা তাঁর আবদ। আবদ মানে অনুগত বান্দা। আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ তায়ালা যে সব কাজ করলে খুশি হন, যা যা করতে বলেছেন তা করা, আর যা যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তায়ালার আদেশ–নিষেধ মেনে চলাই ইবাদত।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালনপালন করেন। তিনিই আমাদের রব। আমাদের জীবন–মৃত্যুর মালিকও তিনিই। তিনি এই মহাবিশ্বকে আমাদের জন্য কতো সুন্দর করে সাজিয়েছেন। আসমান–জমিন, চাঁদ–সুরুজ, ফল–ফসল, গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়–পর্বত সবকিছুই আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবকিছুকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। আর তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–"আর আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"। (সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

আমাদের জন্য কতগুলো নির্ধারিত মৌলিক ইবাদত রয়েছে। যেমন– সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, সাদকা, দান-খয়রাত ও আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি। এগুলো মহানবি (স) যেভাবে আদায় করেছেন, আমাদের যেভাবে আদায় করতে বলেছেন, আমরা ঠিক সেভাবেই আদায় করব।

ইবাাদত শুধু সালাত, সাওম ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবন্ধ নয়। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য রাসুল (স) এর দেখানো পথে যেকোনো ভালো কাজই ইবাদতের মধ্যে শামিল। ভালো কাজের উৎসাহ দেওয়াও ইবাদত। রাসুল (স) বলেছেন, " যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের

পরামর্শ দেয়, সে ব্যক্তিও কাজটি সম্পাদনকারীর সমান পুরস্কার পাবে।" (মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সব সময়ই আমাদের তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা কর্তব্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, সব সময়ই কি ইবাদতে মশগুল থাকা সম্ভব? হ্যাঁ, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা ইবাদত করা সম্ভব। যেমন আমরা যদি বিসমিল্লাহ বলে হালাল খাদ্য খাই, খাওয়ার পরে শোকর করি তবে খাওয়ার সময়টুকু ইবাদতে গণ্য হবে।

পড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে পড়া শুরু করলে যতক্ষণ লেখাপড়া করব, ততক্ষণই ইবাদতে গণ্য হবে। বিসমিল্লাহ বলে স্কুলে যাত্রা শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের রাস্তার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন।

কোনো অন্ধ লোককে রাস্তা পার হতে সাহায্য করলে আল্লাহর নিকট এর পুরস্কার পাওয়া যাবে, এটিও ইবাদত। রাস্তার ময়লা, আবর্জনা বা কষ্টদায়ক কোনো বস্তু অপসারণ করাও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সৎপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, চাষাবাদ এবং অন্য কোনো সৎ পেশায় নিয়োজিত হয়ে যথাযথ কর্তব্য পালন করাও ইবাদতের মধ্যে শামিল। এমনকি ঘুমানোর আগে পাক-পবিত্র হয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে ঘুমালে নিদ্রার সময়টুকুও আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গণ্য। এভাবে আমরা সর্বক্ষণই আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি।

ইবাদতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখের হয়। পরকালে পরম শান্তিময় স্থান জান্নাত লাভ করা যায়। আর যারা ইবাদত করে না, আল্লাহর পথে চলে না, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তারা দুনিয়াতে শান্তি পায় না। পরকালে তাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আমরা আন্তরিকতার সাথে ইবাদত পালন করব। আমাদের জীবন সর্বক্ষণই যাতে আল্লাহর ইবাদতে গণ্য হয় সে চেষ্টা অব্যাহত রাখব।

পাক–পবিত্রতা (طَهَارَةٌ)

আল্লাহর ইবাদতের জন্য পাক–পবিত্র থাকা প্রয়োজন। শরীর, পোশাক এবং স্থান বা পরিবেশ পাকসাফ ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও পবিত্র থাকে। মন পবিত্র থাকলে মনে শান্তি লাগে, ভালো কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অপবিত্র মন শয়তানের কারখানা পাকসাফ না হয়ে সালাত আদায় করা যায় না। অপবিত্র অবস্থায় কুরআন মজিদ স্পর্শ করা যায় না। এজন্যই রাসুল (স) বলেছেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

অর্থ : "পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। (মুসলিম, তিরমিজি)

বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জিত দেহ, মন, পোশাক, স্থান বা পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে তাহারাত বা পবিত্রতা বলে। ওযু, গোসল, তায়াম্মুমের মাধ্যমে শরীর পবিত্র করা হয়। কাপড়–চোপড় ও পোশাক ধুয়ে পাকসাফ করা হয়। ময়লা–আবর্জনা ও নোংরা দূর করে পরিবেশ পাকসাফ করা হয়।

সালাত আদায়ের জন্য শরীর ও পোশাকের মতো স্থান বা পরিবেশ পবিত্র হওয়াও প্রয়োজন। অপবিত্র স্থানে সালাত আদায় করা যায় না। পরিবেশ পবিত্র না থাকলে শরীর ও পোশাক পবিত্র রাখা যায় না। আবার তায়াম্মুম করার জন্য পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পদার্থ প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের শরীর, পোশাক, পানি, মাটিসহ গোটা পরিবেশ পাক সাফ রাখা প্রয়োজন। আমরা সব সময় শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পাকসাফ রাখব। সব সময় পাকসাফ থাকার অভ্যাস গড়ে তুলব।

সালাত (اَلصَّلٰوةُ)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদত করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ইবাদত অর্থ আনুগত্য করা। আল্লাহ তায়ালার নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের যত মাধ্যম বা পন্থা আছে তার মধ্যে সালাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি বান্দার চরম আনুগত্য প্রকাশ পায়।

সালাত শব্দের অর্থ নত হওয়া, বিনয়-বিনম্র হওয়া, দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পড়া। ইসলামের পরিভাষায় আহকাম, আরকানসহ বিশেষ নিয়মে আল্লাহর ইবাদত করাকে সালাত বলে। সালাতকে নামাজও বলে।

ইসলাম পাঁচটি রুকনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রুকন মানে খুঁটি। পাঁচটি রুকন হলো:

১. ইমান, ২. সালাত, ৩. সাওম, ৪. হজ, ও ৫. যাকাত।

ইমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসুল (স) বলেছেন, اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ

অর্থ : "সালাত দীন ইসলামের খুঁটি। (বায়হাকী)

যে সালাত কায়েম করলো, সে দীনরূপ ইমারতটি কায়েম রাখল। আর যে সালাত ত্যাগ করল, সে দীনরূপ ইমারতটি ধ্বংস করল। কুরআন মজিদে বার বার সালাত কায়েমের হুকুম দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: اَقِمِ الصَّلٰوةَ

অর্থ: "সালাত কায়েম করো"। (বনি ইসরাইল: ৭৮)

দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জীবনের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বান্দার মনে আল্লাহর বিধানমতো চলার অনুপ্রেরণা জোগায়। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তায়ালার বেশি নৈকট্য লাভ করতে পারে।

সালাতের মাধ্যমে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়। রাসুল (স) একদিন সাহাবিদের ললেন, "তোমাদের বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে, আর কোনো ব্যক্তি ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচবার [illegible], তবে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবিরা বললেন, [illegible] ময়লা থাকতে পারে না। তখন রাসুল (স) বললেন, ঠিক তেমনি কোনো বান্দা যদি প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করে তার আর কোনো গুনাহ থাকতে পারে না।"– বুখারি ও মুসলিম।

রাসুল (স) আরও বলেছেন, কোনো বান্দা জামাআতের সাথে সালাত আদায় করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে পাঁচটি পুরস্কার দিবেন।

১. তার জীবিকার অভাব দূর করবেন।
২. কবরের আজাব থেকে মুক্তি দিবেন।
৩. হাশরে আমালনামা ডান হাতে দিবেন।
৪. পুলসিরাত বিজলীর মতো দ্রুত পার করবেন।
৫. তাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।

জান্নাত লাভ করতে হলে নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে। মহানবি (স) বলেছেন,

اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ

"সালাত জান্নাতের চাবি"। – তিরমিজি, ইবনেমাজা, আবুদাউদ।

রাসুলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যার সালাতের হিসাব সঠিক হবে তার অন্য সব হিসাবও ঠিক হবে। আর যার সালাতের হিসাব গরমিল হবে, তার অন্যসব হিসাবও গরমিল হবে।" (তাবারানি)

একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে সকলে মিলে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করলে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে মুসলিমগণ দৈনিক পাঁচবার মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়, পরস্পরের খোঁজখবর নিতে পারে। একতা, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। পরস্পরে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সুখে-দুঃখে একে অন্যের সাহায্য করতে পারে। সালাত মানুষের চরিত্র সংশোধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সালাত মানুষকে সব রকম অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত, ৪৫)

পরিকল্পিত কাজ: শিক্ষার্থীরা পাঁচটি মৌলিক ইবাদতের নাম খাতায় লিখবে।

সালাতের সময় (اَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ)

সময়মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম। যথাসময়ে সালাত আদায় না করলে আদায় হয় না। এসম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই সঠিক সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের

জন্য ফরজ"। (সূরা আন নিসা– ১০৩)

রাসুল (স)–এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আল্লাহর কাছে কোন আমলটি উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, সময়মতো সালাত আদায় করা। (বুখারি, মুসলিম)

সালাত আদায়ের সময় সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। নিম্নে সালাতের ওয়াক্তের বিবরণ দেওয়া হলো:

১. **ফজর :** ফজর সালাতের সময় শুরু হয় সুবহি সাদিক হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। রাতের শেষে আকাশের পূর্ব দিগন্তে লম্বা আকৃতির যে আলোর রেখা দেখা যায় তাকেই বলে সুবেহ সাদিক।

২. **যোহর :** দুপুরের সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ছায়া আসলি বাদে কোনো বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এর সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময় যে ক্ষুদ্র ছায়া থাকে তাকেই বলে ছায়া আসলি বা আসল ছায়া।

জুমুআর সালাতের আলাদা কোনো ওয়াক্ত নেই। যোহরের সময়ই জুমুআর সালাত আদায় করতে হয়।

৩. **আসর :** যোহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে সূর্যের রং হলুদ হওয়ার আগেই আসর সালাত আদায় করতে হয়।

৪. **মাগরিব :** সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সময় থাকে।

৫. **এশা :** মাগরিবের সময় শেষ হলেই এশার সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। তবে মধ্য রাতের আগেই আদায় করা উত্তম।

এশার সালাত আদায়ের পরে বিতর সালাত আদায় করতে হয়।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

রাসুল (স) তিন সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন :

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়

৩. সূর্যাস্তের সময়। তবে যুক্তিসংগত কোনো কারণে ঐদিনের আসরের সালাত আদায় না করা হলে তা ঐ সময় আদায় করা যাবে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়ের শুরু ও শেষসহ খাতায় একটি চার্ট তৈরি করবে।

আমরা প্রতিদিন নিয়মিত যে সালাত আদায় করি তা নিচের ছকে দেখানো হলো–

ওয়াক্ত	সুন্নত (মুয়াক্কাদাহ)	ফরজ	সুন্নত (মুয়াক্কাদাহ)	ওয়াজিব
ফজর	২ রাকআত	২ রাকআত		
যোহর	৪ রাকআত	৪ রাকআত	২ রাকআত	
আসর		৪ রাকআত		
মাগরিব		৩ রাকআত	২ রাকআত	
এশা		৪ রাকআত	২ রাকআত	৩ রাকআত (বিতর সালাত)

ছকে বর্ণিত নিয়মিত সালাত ছাড়াও আরও কিছু সুন্নত ও নফল সালাত আছে, যা আমরা পরে জানব।

পরিকল্পিত কাজ : কোন ওয়াক্তে কতো রাকআত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাত আছে

শিক্ষার্থীরা তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

সালাত আদায়ের নিয়ম

সব কাজেরই নিয়ম–পদ্ধতি আছে। নিয়মমতো কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। সালাত একটি বড় ইবাদত। সালাত আদায়েরও নিয়ম–পদ্ধতি আছে। মহানবি (স) নিজে সালাত আদায় করে সাহাবাদের হাতে–কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ তোমরাও সেভাবে সালাত আদায় করবে।"

মহানবি (স)–এর শেখানো নিয়মে সালাত আদায় করতে হবে।

সালাতের সময় হলে আমরা পাক–পবিত্র হয়ে, পাকসাফ কাপড় পরব। তারপর পবিত্র জায়গায় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াব। মনে করতে হবে আমি আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তিনি আমাকে দেখছেন। তিনি আমার অন্তরের খবরও রাখছেন।

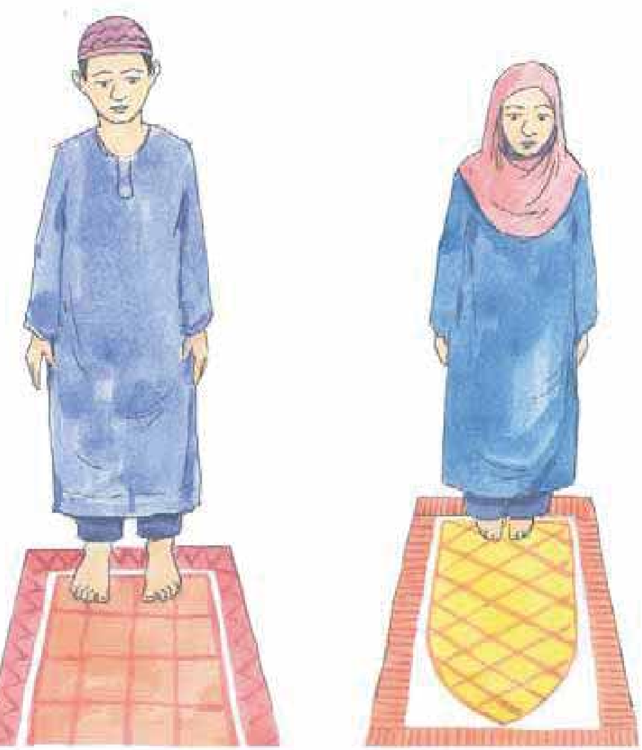

সালাতে দাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি

সালাতের নিয়ত করে আল্লাহু আকবর বলব। একে বলে তাকবিরে তাহরিমা।

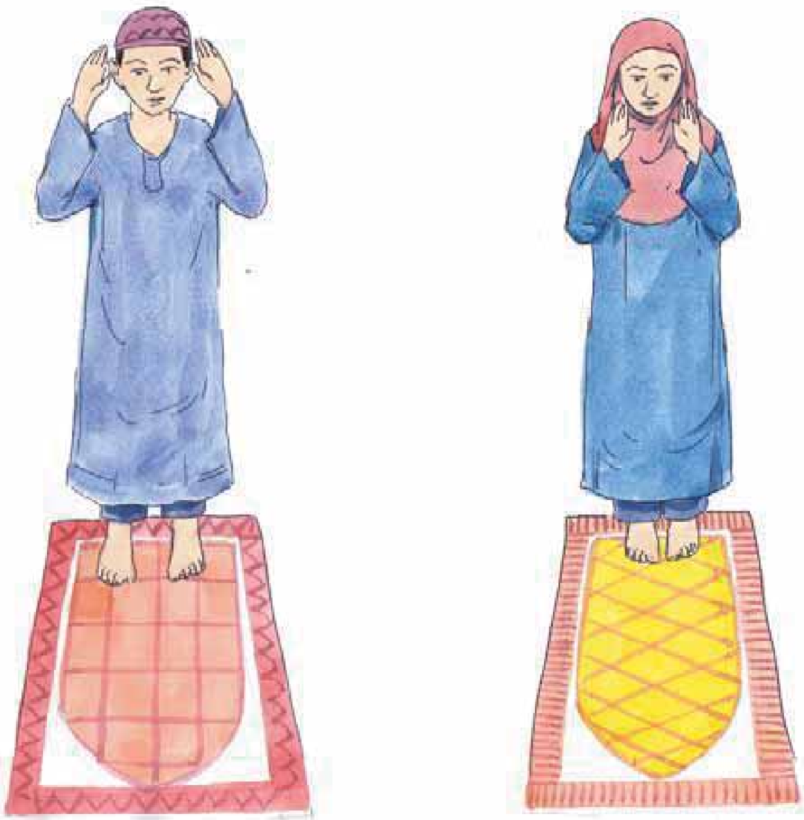

তকবিরে তাহরিমা : হাত তোলার দৃশ্য

তাকবিরের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা দুই হাত কান বরাবর ওঠাবে। এরপর দুই হাত নাভির নিচে বাঁধবে। মেয়েরা দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠাবে। মেয়েরা হাত বাঁধবে বুকের উপর।

হাত বাঁধার নিয়ম

বাম হাতের তালু নাভির নিচে রাখব। আর ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর

রেখে কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কবজি ধরব। মাঝের ৩টি আঙুল বাম হাতের কবজির উপর বিছিয়ে রাখব। মেয়েরা শুধু বাম হাতের উপর ডান হাত রাখব।

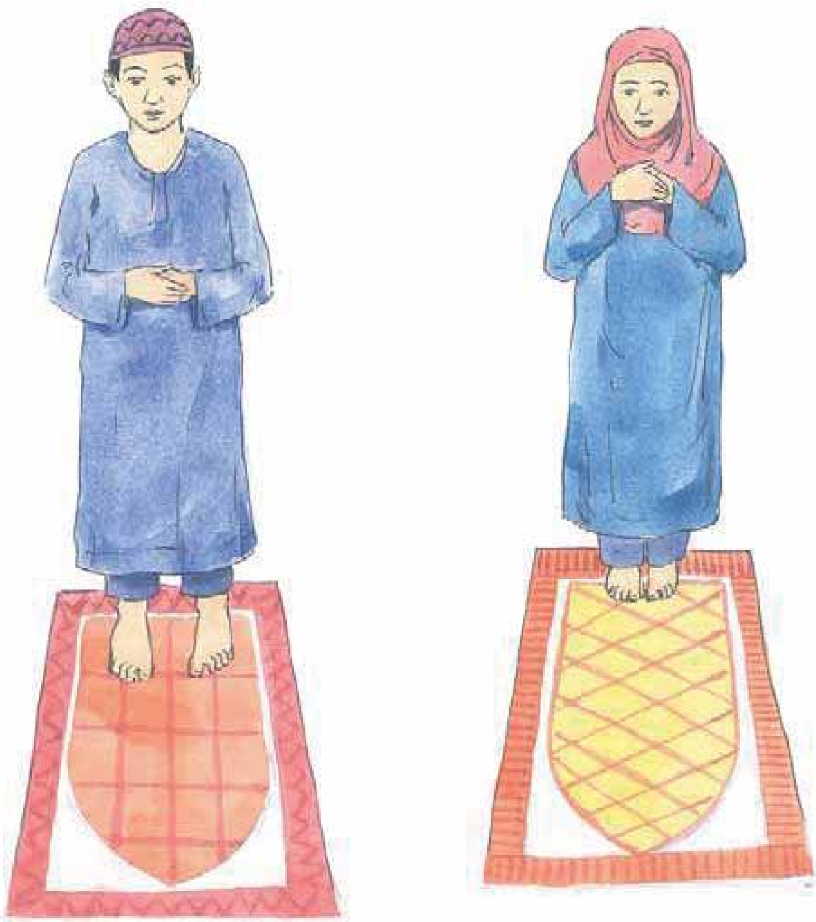

সালাতে সঠিক পদ্ধতিতে হাত বাঁধা অবস্থা

এরপর সানা পড়ব। সানা হলো:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

বাংলা উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা, ওয়া তাআলা জাদ্দুকা, ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার জন্যই সকল

প্রশংসা। তোমার নাম বরকত ও কল্যাণময়। তোমার সম্মান অতি উচ্চে। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।"

এরপর আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম পড়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়ব। পরে সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য কোনো সূরা বা তার অংশ পাঠ করব। তারপর আল্লাহু আকবর বলে রুকু করব। রুকুতে অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' পড়ব।

রুকু করার নিয়ম

রুকুতে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর হয়। কনুই পাঁজর থেকে ফাঁক করে রাখতে হবে।

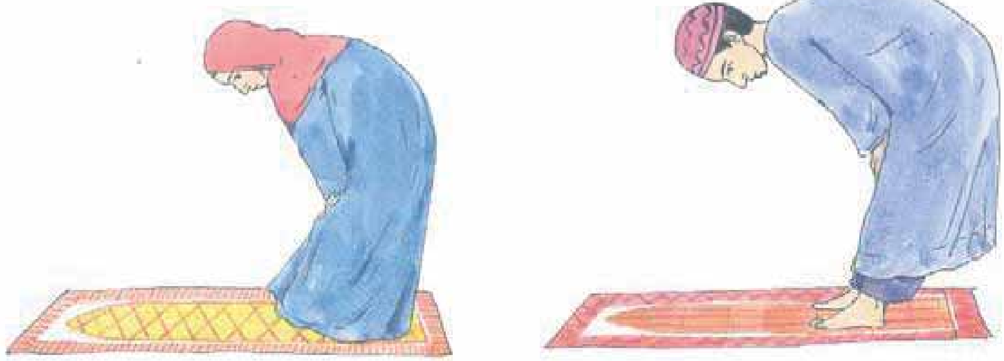

ছবি : সালাতে রুকুর সঠিক পদ্ধতি

মেয়েরা বাম পায়ের টাখনু ডান পায়ের টাখনুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। এরপর মাথা ঝুঁকিয়ে দুই হাতের আঙুলগুলো মেলানো অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর রাখবে। কনুই পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং মাথা এতটুকু ঝুঁকাবে, যাতে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে।

এরপর **'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা'** বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানো অবস্থায় **'রাব্বানা লাকাল হামদ'** বলতে হবে। এরপর **'আল্লাহু আকবর'** বলে সিজদাহ করতে হবে।

সিজদাহ করার নিয়ম

প্রথমে দুই হাঁটু মাটিতে বা জায়নামাজে রাখতে হবে। তারপর দুই হাত মাটিতে রাখতে হবে। তারপর দুই হাতের মাঝখানে মাথা রেখে নাক ও কপাল মাটিতে রাখতে হবে। সিজদাহর সময় দুই হাতের আঙুলগুলো মিলিত অবস্থায় কিবলামুখী করে রাখতে হবে। দুই পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে মাটিতে লাগিয়ে রাখতে হবে। উভয় পা মিলিত অবস্থায় খাড়া থাকবে।

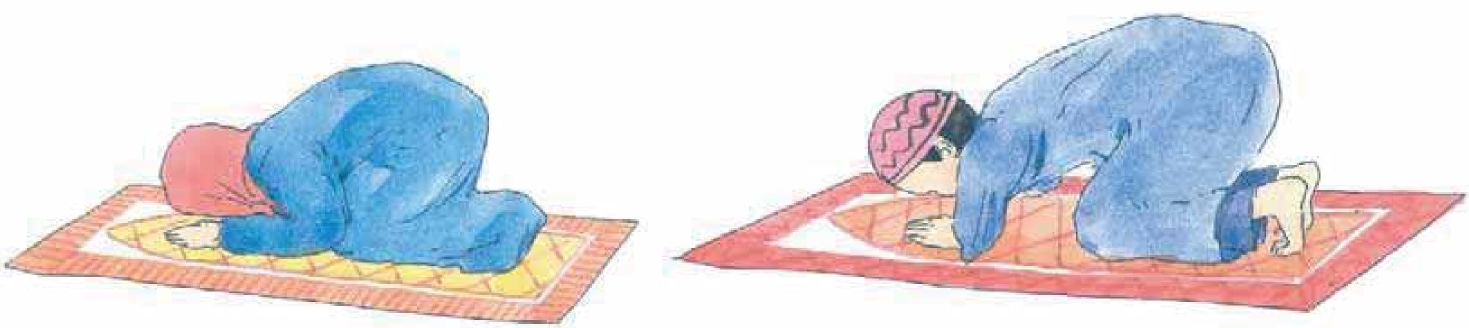

ছবি: সঠিক পদ্ধতিতে ছেলে-মেয়ের সিজদাহরত অবস্থা

মেয়েরা পা খাড়া রাখবে না। উভয় পা ডান দিকে বের করে দেবে এবং মাটিতে বিছিয়ে রাখবে।

ছেলেরা সিজদাহর সময় মাথা হাঁটু হতে দূরে রাখবে। হাতের কবজির উপরের অংশ মাটিতে

লাগাবে না। পায়ের নলা উরু হতে পৃথক রাখবে।

মেয়েরা সর্বাঙ্গ মিলিত অবস্থায় সিজদাহ করবে। মাথা যথাসম্ভব হাঁটুর কাছে রাখবে। উরু পায়ের নলার সাথে এবং হাতের বাজু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। সিজদাহয় অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলতে হয়। এরপর আল্লাহু আকবর বলে সোজা হয়ে বসে দুই হাত হাঁটুর ওপর রাখবে। তারপর আল্লাহু আকবর বলে দ্বিতীয় সিজদাহ করবে এবং পূর্বের মতো তসবি পড়বে। এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এভাবে প্রথম রাকআত শেষ হবে। এরপর দ্বিতীয় রাকআত শুরু হবে। দ্বিতীয় রাকআতেও প্রথম রাকআতের মতো যথারীতি সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা পড়ে রুকু, সিজদাহ করে সোজা হয়ে বসতে হবে। তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলতে হবে। এভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

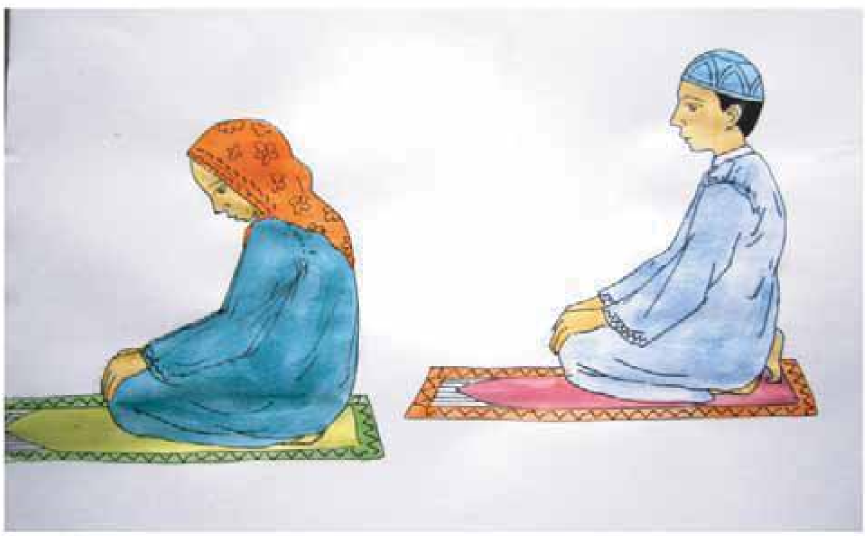

ছবি: তাশাহহুদ পড়ার সঠিক পদ্ধতিতে বসা

তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত হলে তাশাহহুদ অর্থাৎ আবদুহু ওয়া রাসুলুহু পর্যন্ত পড়ে 'আল্লাহ্ আকবর' বলে দাঁড়াতে হবে। এরপর পূর্বের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত শেষ করতে হবে। ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল সালাত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাহিতার সঙ্গে অন্য সূরা পড়তে হবে। কিন্তু ফরজ হলে অন্য সূরা মেলাতে হবে না। এভাবে

যথারীতি তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে মুখ ফিরিয়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে।

ছবি: সালাম ফেরানোর সঠিক পদ্ধতি

সালাতের আহকাম-আরকান

সালাত শুরু করার আগে এবং সালাতের ভেতরে কতকগুলো কাজ আছে। এগুলো অবশ্যই পালন করতে হয়। এগুলোর যেকোনো একটি ছুটে গেলেও সালাত হয় না। এই কাজগুলোকে সালাতের ফরজ বলে। সালাতের ফরজ ১৪টি। সালাতের এই ফরজ কাজগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। ১. আহকাম, ২. আরকান।

আহকাম

সালাত শুরু করার আগে যে ফরজ কাজগুলো আছে, সেগুলোকে সালাতের আহকাম বা শর্ত বলে। আহকাম ৭টি :

১. শরীর পাক : প্রয়োজনমতো ওযু, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে শরীর পাক–পবিত্র করা।

২. কাপড় পাক : পরিধানের কাপড় পাক হওয়া।

৩. জায়গা পাক : সালাত আদায়ের স্থান পাক হওয়া।

৪. সতর ঢাকা : পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডল, হাতের কবজি এবং পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।

৫. কিবলামুখী হওয়া : কাবার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা।

৬. ওয়াক্ত হওয়া : সালাতের নির্ধারিত সময় হওয়া।

৭. নিয়ত করা : যে ওয়াক্তের সালাত আদায় করবে মনে মনে তার নিয়ত করা।

আরকান

সালাতের ভেতরে যে ফরজ কাজগুলো আছে সেগুলোকে সালাতের আরকান বলে। আরকান মোট ৭টি :

১. তাকবিরে তাহরিমা : আল্লাহু আকবর বলে সালাত শুরু করা।

২. কেয়াম : দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। তবে দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে বা শুয়ে যেকোনো অবস্থায় সালাত আদায় করতে হয়।

৩. কেরাত : কুরআন মজিদের কিছু অংশ পাঠ করা।

৪. রুকু করা।

৫. সিজদাহ করা।

৬. শেষ বৈঠকে বসা : যে বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয়, তাকেই বলে শেষ বৈঠক।

৭. কোনো কাজের মাধ্যমে সালাত শেষ করা। সাধারণত সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা হয়।

আমরা সালাতের ফরজ কাজগুলো খুব গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে পালন করব। কারণ ভুলেও

কোনো ফরজ কাজ বাদ পড়লে সালাত হয় না। পুনরায় আদায় করতে হয়।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা খাতায় সালাতের আহকাম-আরকানগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

সালাতের ওয়াজিব

ওয়াজিব মানে অবশ্য করণীয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে ফরজের পরেই ওয়াজিবের স্থান। সালাতের মধ্যে কতগুলো ওয়াজিব কাজ আছে। এর যেকোনো একটিও ইচ্ছা করে বাদ দিলে সালাত আদায় হয় না। ভুলে বাদ পড়লে সাহু সিজদাহ্ দিতে হয়। সালাতের ওয়াজিব ১৪ টি। যথা :

১. প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া

২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা কুরআনের কিছু অংশ পড়া।

৩. সালাতের ফরজ ও ওয়াজিবগুলো আদায় করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৪. রুকু করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৫. দুই সিজদাহ্র মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৬. তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকআতের পর তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসা।

৭. সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৮. মাগরিব, এশার ফরজের প্রথম দুই রাকআতে এবং ফজর ও জুমুআর ফরজ সালাতে এবং দুই ঈদের সালাতে ইমামের সরবে কুরআন পাঠ করা এবং অন্যান্য সালাতে নীরবে পাঠ করা।

৯. বিতর সালাতে দোয়া কুনুত পড়া।

১০. দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

১১. রুকু ও সিজদাহ্য় কমপক্ষে এক তসবি পরিমাণ অবস্থান।

১২. সালাতে সিজদাহ্র আয়াত পাঠ করে তিলাওয়াত সিজদাহ্ করা। কুরআন মজিদে

এমন বিশেষ ১৪টি আয়াত আছে, যা পাঠ করলে বা শুনলে সিজদাহ্ করতে হবে।

১৩. আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা।

১৪. ভুলে কোনো ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সাহু সিজদাহ্ দেওয়া।

সাহু সিজদাহ্

সাহু মানে ভুল। সিজদাহ্ সাহু মানে ভুল সংশোধনের সিজদাহ্।

আমরা আগেই জেনেছি, ইচ্ছা করে কোনো ওয়াজিব বাদ দিলে সালাত হয় না। কিন্তু ভুলে কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে তা সংশোধনের উপায় আছে। আর সে উপায় হলো সাহু সিজদাহ্ করা।

সাহু সিজদাহ্ আদায় করার নিয়ম

সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর শুধু ডান দিকে সালাম ফেরাব। তারপর আল্লাহু আকবর বলে দুটি সিজদাহ্ করব। সিজদাহ্‌র পরে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ব। তারপর ডানে–বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করব।

পরিকল্পিত . . . . . ক্ষার্থীরা সালাতের ওয়াজিবগুলোর একটি তালিকা খাতায় তৈরি করবে।

মসজিদের আদব (اٰدَابُ الْمَسَاجِدِ)

মসজিদ অর্থ সিজদাহ্ করার স্থান। সালাত আদায়ের জন্য নির্ধারিত ইবাদতখানাকে মসজিদ বলে। মসজিদে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতের সাথে আদায় করেন। মসজিদে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত এবং ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ করা হয়। এ জন্যেই মসজিদকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়। নিজেদের বাড়িতে বা অন্য কোনো পবিত্র স্থানেও সালাত আদায় করা যায়। তবে মসজিদে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করলে অনেক বেশি সাওয়াব হয়।

দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদ। যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করে, আল্লাহ তাদের খুব ভালোবাসেন।

পৃথিবীতে অসংখ্য মসজিদ আছে। বাংলাদেশে দুই লাখেরও বেশি মসজিদ আছে। ঢাকা শহরকে বলা হয় মসজিদের শহর। দুনিয়ার সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর। সকল

মসজিদই পবিত্র ও সম্মানিত। তবে তিনটি মসজিদের মর্যাদা বেশি। এগুলো হলো মসজিদে হারাম বা কাবা শরিফ। কাবা শরিফ মক্কায় অবস্থিত। মসজিদে নববি বা মদিনার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস। মসজিদে আকসা জেরুজালেমে অবস্থিত।

আমরা জানি মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ও সম্মানিত স্থান। আল্লাহ তায়ালা আমাদের খালিক, মালিক। তিনি আমাদের জীবন–মৃত্যুরও মালিক। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাৎ ঘটে। বান্দা তার মাবুদের দরবারে হাজিরা দেয়। আল্লাহর দরবারে অতি বিনয় ও বিনম্রভাবে হাজির হতে হবে। অত্যন্ত কাতরভাবে অন্তরের আকুতি জানাতে হবে। সুতরাং মসজিদের কতগুলো আদব মেনে চলতে হয়। যেমন :

১. পাক–পবিত্র শরীর ও পোশাক নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়।

২. পবিত্র মন ও বিনয়–বিনম্রতার সাথে মসজিদে প্রবেশ করা।

৩. মসজিদে প্রবেশের সময় এ দোয়া পড়া– اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

৪. মসজিদে প্রবেশের সময় হুড়োহুড়ি, ধাক্কা–ধাক্কি না করা। মসজিদে কোনো খালি জায়গা [illegible] না গিয়ে অন্যকে সামনে যেতে বলা উচিত নয়। বেশি জায়গা জুড়ে বসবে না, অন্যদের বসার জায়গা করে দেবে।

৫. লোকজনকে ডিঙিয়ে সামনের দিকে না যাওয়া।

৬. মসজিদে কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা।

৭. নীরবতা পালন করা। উচ্চস্বরে কথা না বলা।

৮. কুরআন তিলাওয়াত ও ধর্মীয় কথাবার্তা শোনা।

৯. কোনো অবস্থাতেই হৈ চৈ, শোরগোল না করা।

১০. সালাতরত কোনো মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত না করা।

১১. মোবাইল খোলা রেখে বা অন্য কোনোভাবে মসজিদের শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করা।

১২. মসজিদে বিনয় ও একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা।

১৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পড়া–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।

মসজিদ প্রধানত সালাত আদায়ের জন্য তৈরি হলেও একে কেন্দ্র করে ইসলামি শিক্ষা দীক্ষা পরিচালনা করা যায়। সুন্দর সমাজ ও শিক্ষা–সংস্কৃতি সৃষ্টিতে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ–ভূমিকা রাখতে পারে। মক্তব ও গণশিক্ষা পরিচালিত হতে পারে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মসজিদের আদবগুলোর একটি তালিকা খাতায় তৈরি করবে।

সাওম (اَلصَّوْمُ)

সাওম আরবি শব্দ।এর অর্থ বিরত থাকা, আত্মসংযম। একে বহুবচনে সিয়াম বলে। সাওমকে ফারসি ভাষায় রোযা বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের প্রধান পাঁচটি রুকনের মধ্যে সাওম একটি। মৌলিক ইবাদতগুলোর মধ্যে ইমান ও সালাতের পরেই সাওমের স্থান। সাওম ধনী–দরিদ্র সকল মুসলমানের ওপর ফরজ ইবাদত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–"হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো।" (সূরা বাকারা : ১৮৩)। যেহেতু সাওমকে ফরজ করা হয়েছে, সুতরাং যে তা অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বিনা ওজরে পালন করবে না সে

গুনাগার হবে।

সাওম শুধু আমাদের জন্যই ফরজ নয়, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও ফরজ ছিল।
সাওম পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া মানে আল্লাহকে ভয় করা, সব রকম পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, সংযম অবলম্বন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" (বাকারাহ : ১৮৩)
সাওমের মাধ্যমে তাকওয়া শুধু অর্জনই হয় না, এতে তাকওয়ার অনুশীলন ও ট্রেনিং হয়ে থাকে। পাপাচার ও লোভ–লালসা থেকে বিরত থাকা সহজ কাজ নয়। এ জন্য দীর্ঘমেয়াদি বাস্তব প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন প্রয়োজন। আর এই বাস্তব প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন হয় দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে।

এটি আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির উৎকৃষ্ট উপায়। সাওম পালনকালে মুমিন ব্যক্তি কু–প্রবৃত্তি, কামনা–বাসনা ও লোভ–লালসা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। সিয়াম পালনকারীর সামনে যত লোভনীয় খাবার আসুক, যতই ক্ষুধা–তৃষ্ণা লাগুক সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে কিছুই খায় না। যেখানে দেখার মতো কেউ নেই সেখানেও এক বিন্দু পানি পান করে না।

সাওম হলো আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধির ঢাল

সাওম পালনের সময় মিথ্যা, প্রতারণা, হিংসা–বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরচর্চা, ধূমপান ইত্যাদি ত্যাগ করতে হয়। সুতরাং এসব পাপকর্ম ও বদভ্যাস ত্যাগ করা সহজ হয়। এ জন্য সাওমকে আত্মরক্ষার ঢাল বলা হয়েছে। রাসুল (স) বলেছেন,

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ ... ালস্বরূপ।" (বুখারি)

সাওম পালন উন্নত চরিত্র ও আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাওম পালনের সময় লোভ–লালসা, পাপাচার, মিথ্যাচার, ঝগড়া–বিবাদ, ত্যাগ করতে হয়। অশ্লীল কথা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এতে ব্যক্তি চরিত্র যেমন উন্নত হয়, তেমনি সুন্দর সমাজ গঠনেও সহায়ক হয়।

সাওম পালনের মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। পানাহার ত্যাগের মাধ্যমে ধনীরা দরিদ্রের অনাহারে–অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট প্রত্যক্ষভাবে এবং বাস্তবে বুঝতে পারে। ক্ষুধার কী জ্বালা, তা তারা অনুভব করতে পারে। তাই তারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তাদের সাহায্য–সহযোগিতা ও দান–খয়রাত করে। রাসুল (স)

রমযানকে 'সহানুভূতির মাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সাওম পালনে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। তাই এ মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। আর এই ধৈর্যের পুরস্কার হিসেবে হাদিস শরিফে জান্নাত দানের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সাওমের মাসকে ফজিলতের দিক দিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং তৃতীয় অংশ নাজাতের। নাজাত মানে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি।

সাওম একমাত্র আল্লাহরই জন্য নিবেদিত। তাই এর পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ দেবেন। আল্লাহ বলেন, "সাওম কেবল আমারই জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।" (বুখারি ও মুসলিম)

শুধু সাওম পালনেই ফজিলত নয়; সাওমের সম্মান করলে, সাওম পালনকারীর সম্মান ও সেবা করলেও অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। কোনো সাওম পালনকারীকে ইফতার করালে তার সাওমের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। অবশ্য সাওম পালনকারীর সওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না।

সাওম পালনকারীর জন্য দুটো খুশি, একটি তার ইফতারের সময় এবং আর একটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সাওম পালনকারী আল্লাহ তায়ালার কাছে উচ্চতর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং সাওমের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত অপরিসীম।

সাওমের নিয়ত

রমযানের শেষ রাতে সেহরি খাওয়ার পর এই বলে সাওমের নিয়ত করতে হয়– 'হে আল্লাহ! আমি আগামীকাল রমযান মাসের ফরজ সাওম রাখার নিয়ত করলাম। তুমি দয়া করে আমার সাওম কবুল করো।'

ইফতারের সময় বলতে হয় : اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ۔

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা সুম্‌তু ওয়া আলা রিজকিকা আফতারতু।

অর্থ: "হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সাওম রেখেছি এবং তোমার দেওয়া রিজিক দ্বারা ইফতার করছি।"

তারাবির সালাত

রমযানে এশার সালাত আদায়ের পর তারাবির সালাত আদায় করতে হয়। তারাবির সালাত বিশ রাকাআত। এ সালাত আদায় করা সুন্নত। রাসুল (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযান মাসে তারাবির সালাত আদায় করে, তার অতীতের গুনা মাফ হয়ে যায়।"

আমরা যথাযথভাবে রমযানের সাওম পালন করব। নিয়মিত তারাবি আদায় করব।

সাওম ভঙ্গ হয়, নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ করব না। মিথ্যা কথা বলব না। পরনিন্দা ও পাপাচারে লিপ্ত হব না।

যাকাত (اَلزَّكٰوةُ)

'যাকাত' শব্দের অর্থ পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। মুসলমানদের নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বছর পূর্তিতে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত খাতসমূহে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে সালাতের পরেই যাকাতের গুরুত্ব বেশি। কুরআন মজিদের বহু স্থানে আল্লাহ তায়ালা সালাতের সাথে যাকাতের কথাই উল্লেখ করে বলেছেন,

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও।" (সূরা মুয্যামিল- ২০)

যাকাত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ধনীদের সম্পদে গরিবদের, নিঃস্বদের অধিকার। যাকাত দেওয়া দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের কোনো অনুগ্রহ বা অনুকম্পা নয়; বরং তার সম্পদকে পবিত্র করার এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার একটি অবশ্য করণীয় ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (আল-যারিয়াত- ১৯)

আমরা জেনেছি, যাকাতের একটি অর্থ পবিত্রতা। যাকাত দিলে দাতার অন্তর কৃপণতার কলুষতা থেকে পবিত্র হয়। তার আমলনামা গুনা থেকে পবিত্র হয়। ধনীদের সম্পদে গরিবদের অধিকার আছে, একটি নির্দিষ্ট অংশ মিশে আছে। গরিবদের অংশ দিয়ে দিলে

অবশিষ্ট সম্পদ মালিকের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। যাকাত না দিলে তা ময়লাযুক্ত থাকে। যাকাত দিলে তা ময়লামুক্ত হয়ে যায়।

যাকাতের আর এক অর্থ বৃদ্ধি। যাকাত দিলে যাকাত দাতার সাওয়াব বৃদ্ধি হয়। সামান্য যাকাতের বিনিময়ে পরকালে প্রচুর পুরস্কার লাভ করবেন। শুধু তাই নয়, দুনিয়াতেও আল্লাহ তায়ালা তার সম্পদে রহমত ও বরকত দান করবেন। তার অর্জিত সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তোমরা যে সুদের কারবার করে থাকো মানুষের সম্পদের সঙ্গে মিলে সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে, আল্লাহর কাছে তা মোটেই বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দিয়ে থাকো, তাই কেবল বৃদ্ধি পায়– এরাই সম্পদশালী। (সূরা রূম– ৩৯)

যাকাত দিলে ধনী–গরিবের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। মহানবি (স) বলেছেন,

اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ

অর্থ : যাকাত ইসলামের (ধনী–গরিবের মধ্যে) সেতুবন্ধ। (মুসলিম)।

যাকাত দিলে ধনী–গরিবের ব্যবধান কমে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের খালিক ও মালিক। সকল ধনসম্পদের মালিকও তিনি। 'সম্পদের মালিকানা আল্লাহর' এ কথার বাস্তব প্রমাণ ঘটে যাকাতে। সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ বিধায় সম্পদ তাঁর বিধান অনুযায়ী গরিবদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। যাকাত না দিলে আল্লাহর মালিকানা অস্বীকার করা হয়। যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে, যাকাত দেয় না, তাদের পরকালে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে।

যাকাতের নিসাব

নিসাব মানে নির্ধারিত পরিমাণ বা মাত্রা। যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয়, তাকে নিসাব বলে। অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী হলে বছর পূর্তিতে একটি নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর নির্ধারিত খাতে যাকাত দিতে হয়। নিম্নোক্ত সম্পদ নিসাব পরিমাণ থাকলে যাকাত দিতে হয়।

১. সোনা, রুপা (নগদ অর্থ ও গহনাপত্রসহ), ২. গবাদি পশু, ৩. জমিতে উৎপন্ন ফসল, ৪. ব্যবসা–বাণিজ্যের পণ্য, ৫. অর্জিত সম্পদ ইত্যাদি।

সোনা সাড়ে সাত ভরি বা সাড়ে সাত তোলা (৮৭.২৫ গ্রাম) অথবা রুপা সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৬১২.২৫ গ্রাম) বা এর তৈরি গহনা থাকলে যাকাত দিতে হয়। এর কোনো একটি অথবা উভয়টির মূল্য পরিমাণ অন্য কোনো সম্পদ থাকলেও যাকাত দিতে হবে।

নিসাব পরিমাণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়। প্রতি একশত টাকার যাকাত হয় আড়াই টাকা। উৎপাদিত ফসল, দ্রব্যাদি, পশু ইত্যাদির যাকাতের হিসাব কষে জানতে পারব।

যাকাতের মাসারিফ বা খাত

'মাসারিফ' অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ। যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায় তাদেরকে বলে যাকাতের মাসারিফ। সবাইকে যাকাত দেওয়া যায় না। কেবলমাত্র আট শ্রেণির লোককে যাকাত দেওয়া যায়। এরা হলো :

১. ফকির বা অভাবগ্রস্ত, ২. মিসকিন বা সম্বলহীন, ৩. যাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ, ৪. ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এমন ব্যক্তি ৫. দাসমুক্তি, ৬. ঋণগ্রস্ত, ৭. আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও ৮. অসহায় পথিকদের জন্য। যাকাতের এ খাতগুলো আল্লাহর নির্ধারিত।

যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয়। সম্পদ ও সওয়াব বৃদ্ধি পায়। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর হয়। মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধ সৃষ্টি হয়। সমাজ থেকে অভাবজনিত অসামাজিক কার্যকলাপ ও অপরাধ দূর হয়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। আল্লাহ তায়ালা খুশি হন।

যাকাত না দিলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। বৈরিতা সৃষ্টি হয়। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। আখিরাতে রয়েছে কঠিন আজাব। আমরা হিসাব করে নিয়মিত যাকাত দেওয়ার জন্য পিতা মাতাকে বলব। আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করব। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা যাকাতের মাসারিফ অর্থাৎ যাদের যাকাত দেওয়া যায়, খাতায় তাদের একটি তালিকা তৈরি করবে।

হজ (اَلْحَجُّ)

হজ শব্দের অর্থ- ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, কোনো সম্মানিত স্থান দর্শনের সংকল্প করা।

আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষ অবস্থায়, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্ধারিত নিয়মে, নির্দিষ্ট কতগুলো অনুষ্ঠান পালন করাকে হজ বলে। নির্দিষ্ট সময় বলতে ৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত সময়কে বোঝায়। বিশেষ অবস্থা বলতে ইহরামের অবস্থাকে বোঝায়। নির্দিষ্ট স্থান বলতে কাবা শরিফ (সাফা–মারওয়াসহ) এবং তার আশপাশের আরাফাত মিনা, মুজদালিফা প্রভৃতি স্থানকে বোঝায়। নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান বলতে ইহরাম, তওয়াফ, সাঈ, ওকুফ (অবস্থায়) কুরবানি প্রভৃতি হজ–এর নির্ধারিত অনুষ্ঠানগুলোকে বোঝায়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো হজ। হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান ও সামর্থ্যবান মুসলিম নর–নারীর ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ। এরপর যতবার হজ করবে, তা হবে নফল। নফল হজেও অনেক সাওয়াব।

হজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً۔

অর্থ : "আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরিফের হজ পালন করা মানুষের ওপর অবশ্য কর্তব্য; যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে।" (সূরা আলে ইমরান –৯৭)

যে সব লোক বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যাতায়াতের দৈহিক ক্ষমতা রাখে এবং হজ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে যাতায়াতের খরচ বহন করতে সক্ষম তাদের ওপর হজ ফরজ। মহিলা হাজি হলে একজন পুরুষ সফরসঙ্গী থাকতে হবে এবং সফরসঙ্গীর ব্যয় নির্বাহে সক্ষম হতে হবে। মহিলা হাজির সফরসঙ্গী হবেন স্বামী অথবা এমন আত্মীয়, যার সাথে বিবাহ সম্পর্ক হারাম। যেমন–পিতা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা ইত্যাদি।

কাবা আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর প্রাচীনতম ইবাদতখানা। এটিই আমাদের কেবলা, বিশ্ব মুসলিমদের কেবলা এবং মিলনকেন্দ্র। সুতরাং হজ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। বিশ্ব মুসলিম যে এক, অখণ্ড উম্মত, হজ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। গায়ের রং, মুখের ভাষা, আর জীবন পদ্ধতিতে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এই সম্মেলনে তারা একাকার হয়ে যায়, তাদের সব পার্থক্য দূর হয়ে যায়। সকলের পরনে ইহরামের সাদা কাপড়। সকলের ধর্ম এক, উদ্দেশ্য এক, অন্তরে এক আল্লাহর ধ্যান, সকলেই আল্লাহর বান্দা।

সকলেই ভাই ভাই। এ সবই মুসলিমদের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের এক অপূর্ব পুলক শিহরণ জাগায়। তাদের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে ওঠে। সবার কণ্ঠে একই আওয়াজ "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক"। "হাজির হে আল্লাহ আমরা তোমার দরবারে হাজির।" হজ প্রত্যেক হাজিকে মুসলিম বিশ্বের লাখো মুসলিমদের সাথে পরিচয়ের বিরাট সুযোগ করে দেয়। একটি সফরে বহু সফরের সুফল পাওয়া যায়। ইসলামের ঐক্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও প্রাণচাঞ্চল্য বজায় রাখার ব্যাপারে হজের তাৎপর্য অপরিসীম। হজ মানুষের অতীত জীবনের গুনাগুলো ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়, মাফ করে দেয়। রাসুল (স) বলেছেন, "পানি যেমন ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়, হজও তেমনি গুনাগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।" (বুখারি)

রাসুল (স) আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ করল, তারপর কোনো অশ্লীল কাজ করল না, পাপ কাজ করল না, সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরল। (বুখারি ও মুসলিম)।

হজের প্রধান কাজগুলো হলো ইহরাম বাঁধা, কাবাঘর তওয়াফ করা। সাফা-মারওয়ার মাঝে সাই করা। আরাফাত ময়দানে ওকুফ বা অবস্থান করা। মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করা। মিনায় কুরবানি করা ইত্যাদি।

হজের ফরজ

হজের ফরজ তিনটি : ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফাতে অবস্থান এবং ৩. তওয়াফে যিয়ারত। কোনো ফরজ বাদ পড়লে হজ হয় না।

১. হজের প্রথম ফরজ হলো ইহরাম বাঁধা, কয়েকটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হজ বা উমরার নিয়ত করাকে ইহরাম বলে। ওযু, গোসলের পরে সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরে ইহরাম বাঁধতে হয়। মৃতপ্রায় ফকিরের বেশে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হয়। এ সময় রঙিন কাপড় পরা যাবে না। সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। চুল, নখ কাটা যাবে না। কোনো স্থলপ্রাণী শিকার করা যাবে না। এমনকি মশা, মাছি, উকুন ইত্যাদিও মারা যাবে না। সব ধরনের ঝগড়া, বিবাদ ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। ইহরামের সাথে সাথে "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লা-শারিকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকাওয়াল মুল্‌ক লা শারিকা লাকা" দোয়াটি বারবার পড়তে হবে। একে বলে তালবিয়াহ।

২. ওকুফ বা অবস্থান। হজের দ্বিতীয় ফরজ হলো ৯ই জিলহজ তারিখে আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা।

৩. তওয়াফে যিয়ারত। হজের তৃতীয় ফরজ হলো তওয়াফে যিয়ারত করা। কুরবানির দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১০–১২ তারিখের মধ্যে কাবাঘরে তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করাকে তওয়াফে যিয়ারত বলে। এই তিন দিনের যেকোনো দিন এই তওয়াফ করা যায়। তবে প্রথম দিনে তওয়াফ করা উত্তম। এই তিন দিনের পরে তওয়াফ করলে দণ্ডস্বরূপ (দম) একটি কুরবানি করতে হবে।

কুরবানি (اَلْاُضْحِيَّةُ)

কুরবানি শব্দের অর্থ নৈকট্য, ত্যাগ, উৎসর্গ। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও উৎসর্গ করা।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ১০ জিলহজ হতে ১২ জিলহজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহপালিত হালাল পশু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাকে কুরবানি বলে। কুরবানি করতে হয় উট, মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি গৃহপালিত হালাল, সুস্থ ও সবল পশু দ্বারা।

নিসাব পরিমাণ মালের মালিক সকল প্রাপ্তবয়স্ক নর–নারীর ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব।

কুরবানি আল্লাহর নবি হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)–এর অতুলনীয় নিষ্ঠা ও অপূর্ব ত্যাগের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করে। কুরবানি দ্বারা মুসলিম মিল্লাত ঘোষণা করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা জানমাল সবকিছু কুরবানি করতে প্রস্তুত । কুরবানির নজিরবিহীন ত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করে মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে শপথ করেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের জান–মাল, জীবন–মৃত্যু তোমারই জন্য উৎসর্গ। তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যেভাবে পশু কুরবানি করছি, তেমনিভাবে আমাদের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হব না।

কুরবানি করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে। অহংকার বা গর্বের মনোভাব নিয়ে নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আল্লাহর নিকট সেগুলোর (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত কিছুই পৌঁছায় না, পৌঁছায় শুধু তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা হজ, আয়াত– ৩৭)

মানুষের মধ্যে যেমন মনুষ্যত্ব আছে, তেমনি পশুত্বও আছে। কুরবানির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরবানির মাধ্যমে পশুত্বকে হত্যা করে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা।

১. আমরা আগেই জেনেছি যে, নিসাব পরিমাণ মালের মালিক মুসলিম নর-নারীর ওপর কুরবানি ওয়াজিব। তবে নাবালেগের ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয়, দিলে সাওয়াব হয়।

২. জিলহজ মাসের ১০, ১১ এবং ১২ তারিখ পর্যন্ত কুরবানির সময়। তবে ইদুল আজহার সালাতের পরে কুরবানি করতে হয়।

৩. ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি গৃহপালিত হালাল, সুস্থ ও সবল পশু দ্বারা কুরবানি করতে হয়। পশুটি নির্দোষ ও নিখুঁত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা জনপ্রতি একটি করে কুরবানি করতে হয়। গরু, মহিষ ও উট সাতজন পর্যন্ত শরিক হয়ে কুরবানি করা যায়। তবে সবার উদ্দেশ্যই আল্লাহর নৈকট্যলাভ হতে হবে।

৫. ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার বয়স কমপক্ষে এক বছর; গরু, মহিষ দুই বছর এবং উট কমপক্ষে পাঁচ বছর বয়সের হতে হবে।

৬. কুরবানির গোশত সাধারণত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরিব-মিসকিন, এক ভাগ আত্মীয় স্বজন এবং এক ভাগ নিজে রাখতে হয়।

৭. কুরবানির গোশত বা চামড়া মজুরির বিনিময়ে দেওয়া যায় না। কুরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য মাটিতে পুঁতে রাখতে হয়।

কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আল্লাহর আদেশে একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী হাজিরা এবং তাঁদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ)-কে মক্কায় তখনকার দিনে লুপ্ত কাবার নিকটবর্তী জনমানব শূন্য মরুভূমিতে রেখে চলে যান। আল্লাহ তায়ালার অপার করুণায় তাঁরা নিরাপদে থাকেন।

ইসমাঈল (আ) যখন কিশোর বয়সে উপনীত, তখন ইবরাহীম (আ) তাঁদের দেখতে এলেন। এবার তিনি এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহ তাঁকে আদেশ করছেন প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানি করতে। একই স্বপ্ন দেখলেন

বারবার। তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পুত্রকে কুরবানি করতে মনস্থির করলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা ইসমাঈল (আ)-কে জানিয়ে বললেন, "হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন তোমার অভিমত কী বলো।" উত্তরে ইসমাইল (আ) বললেন, "হে আমার আব্বা, আপনি তাই করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" (সূরা আস–সাফফাত–১০২)

পথে পিতা–পুত্রকে শয়তান ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁরা শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

ইবরাহীম (আ) আল্লাহর প্রতি তাঁর পুত্রের এমন আনুগত্য, নিষ্ঠা ও সাহসিকতাপূর্ণ উত্তরে খুশি হলেন। তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করতে তাঁর গলায় ছুরি চালালেন। পুত্র ইসমাঈলও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধারাল ছুরির নিচে মাথা পেতে দিলেন। এবারের কঠিন পরীক্ষায়ও পিতা–পুত্র উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহ তায়ালা কুরবানি কবুল করলেন এবং ইসমাঈলকে রক্ষা করলেন। তাঁর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ)–এর অপরিসীম আনুগত্য ও অপূর্ব ত্যাগের ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং মুসলিমদের ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করার জন্য তখন থেকে কুরবানির প্রচলন রয়েছে। এটি চিরকালের জন্য মানবসমাজে একটি পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত।

কুরবানির শিক্ষা

১. মুসলিমদের ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করাই কুরবানির উদ্দেশ্য।

২. আমাদের জান–মাল, জীবন–মৃত্যু আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা।

৩. কুরবানি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাকওয়া যাচাই করেন। আল্লাহর কাছে কুরবানির পশুর রক্ত, মাংস কিছুই পৌঁছায় না, পৌঁছায় শুধু অন্তরের তাকওয়া ও নিষ্ঠা।

৪. মানুষের মধ্যে যেমন মনুষ্যত্ব আছে, তেমনি পশুত্বও আছে। কুরবানির মাধ্যমে পশুত্বকে হত্যা করে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা হয়। মানুষের লোভ–লালসা, হিংসা–বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি পাশবিক চরিত্র বিসর্জন দিয়ে মানবীয় গুণাবলি উজ্জীবিত করতে পারলেই কুরবানি স্বার্থক হয়।

৫. কুরবানির একটি অংশ গরিব–মিসকিনকে দিতে হয়, এতে তাদের একটু ভালো খাওয়ার সুযোগ হয়। আত্মীয়স্বজনকে দিতে হয়, এতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়। সকলের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

আকিকা (اَلْعَقِيْقَةُ)

'আকিকা' শব্দের অর্থ ভাঙা, কেটে ফেলা। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে সন্তানের কল্যাণ ও হিফাজত কামনায় আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানির মতো কোনো গৃহপালিত হালাল পশু জবাই করাকে আকিকা বলে।

আকিকা করতে হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আকিকা করা সুন্নত। এতে সন্তান যেমন আল্লাহর রহমতে বালা–মুসিবত ও বিপদ–আপদ থেকে নিরাপদ থাকে, তেমনি অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। সন্তানের আকিকা করতে অবহেলা করা উচিত নয়। হাদিস শরিফে আছে– "প্রতিটি নবজাত সন্তান আকিকার সাথে বন্দী। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু জবাই করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে।" (তিরমিজি)

রাসুল (স) নিজের আকিকা নিজেই করেছিলেন। তিনি অন্যকেও আকিকা করতে উৎসাহ দিতেন। সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আকিকা করা উত্তম। তবে ১৪, ২১ বা ২৮-তম দিনেও আকিকা করা যায়।

মুসলিম পিতা–মাতাকে সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে চারটি কাজ করতে হয়–

১. সন্তানের সুন্দর ইসলামি নাম রাখা। নাম শুনলেই যেন বোঝা যায় যে, সে মুসলিম সন্তান।

২. মাথা কামানো।

৩. মাথার চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রুপা দান করা।

৪. আকিকা করা।

আদায়ের নিয়ম

ছেলে সন্তানের জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বার দুটি অথবা গরু, মহিষ বা উটের দুই ভাগ এবং মেয়ে সন্তানের জন্য ছাগল, ভেড়া, দুম্বার একটি অথবা গরু, মহিষ বা উটের এক

অংশ আকিকা দিলে যথেস্ট হবে। হাদিসে আছে :

“ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবাহ করাই যথেষ্ট।” (আবু দাউদ ও নাসায়ি)

সামর্থ্য না থাকলে ছেলে সন্তানের জন্যও একটি দেওয়া যাবে। যে সকল পশু দ্বারা কুরবানি করা যায়, সে সকল পশু দ্বারা আকিকা করা যায়। কুরবানির সাথে আকিকারও অংশীদার হওয়া যায়। কুরবানির পশুর গোশত যেভাবে বণ্টন করা উত্তম, আকিকার গোশতও সেভাবে বণ্টন করা উত্তম। আকিকার পশুর চামড়াও গরিব মিসকিনদের দান করতে হয়।

ব্যবহারিক দোয়া

পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের খালিক ও মালিক। তিনি আমাদের মাবুদ। আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য রাসুল(স)–এর দেখানো পথে যেকোনো বৈধ কাজই আল্লাহর ইবাদত। আল্লাহর রহমত ছাড়া কোনো কাজে সফলতা আসে না। আমরা সব সময় আল্লাহর রহমত চাইব, তাঁর কাছে সাহায্য চাইব। তাঁরই নাম নিয়ে ভালো কাজ শুরু করব। রাসুল(স) কোনো কাজ শুরু করার আগে দোয়া পড়তেন। আমরা কাজ শুরু করার আগে দোয়া পড়ে নেব। এগুলোকে বলা হয় ব্যবহারিক দোয়া । এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজের আগে পড়তে হয় ।

১. কোনো ভালো কাজ শুরু করার আগে বলব –

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ : “দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।”

২. খাওয়ার পরে আল্লাহর শোকর করে বলব –

আলহামদু লিল্লাহ لْحَمْدُ لِلّٰهِ رَ

অর্থ : “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৩. পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলব –

আসসালামু আলাইকুম اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

অর্থ : আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

৪. সালামের জবাবে বলব –

ওয়াআলাইকুমুসসালামু ওয়া রহমাতুল্লাহ– وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ

অর্থ : আপনার ওপরও শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

৫. হাঁচি দিয়ে বলতে হয়–

আলহামদু লিল্লাহ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৬. যে শুনবে সে বলবে–

ইয়ার হামুকাল্লাহু يَرْحَمُكَ اللهُ

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন।

৭. ঘুমানোর আগে পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমূতু ও আহইয়া।

অর্থ : হে আল্লাহ, তোমার নাম নিয়ে ঘুমাই, আর তোমার নাম নিয়েই জেগে উঠি।

৮. ঘুম থেকে জেগে এ দোয়া পড়তে হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

বাংলা উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের ঘুমের পর জাগালেন, তাঁর কাছেই আমরা পুনরায় ফিরে যাব।

৯. কোনো কবর দেখলে এই দোয়া পড়বে–

আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর – اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ

অর্থ : হে কবরবাসীগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

১০. মসজিদে প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়তে হয়–

আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা– اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

১১. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়তে হয়–

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা– اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি।

আমরা ব্যবহারিক দোয়াগুলো ঠিকমতো শিখব এবং নিয়মিত পড়ব। এতে আল্লাহ তায়ালা খুশি হবেন। আমাদের কাজে বরকত ও সওয়াব হবে। বড় হয়ে আরও দোয়া শিখব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মসজিদে প্রবেশের দোয়া আরবি ও বাংলায় খাতায় লিখবে।

পরিচ্ছন্নতা – اَلنَّظَافَةُ

শরীর, পোশাক ও স্থান বা পরিবেশের পরিষ্কার, পরিপাটি, নির্মল ও ময়লামুক্ত অবস্থাকে বলে পরিচ্ছন্নতা। আর বিশেষ পদ্ধতিতে দেহ, মন, পোশাক ও পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাকে বলে তাহারাত বা পবিত্রতা। পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতাকে আলাদা করা যায় না।

পরিচ্ছন্নতা বা পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। আল্লাহ তায়ালা চিরপবিত্র। যারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পাকসাফ থাকে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয় নবি (স) সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তিনি সবাইকে পাকসাফ ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকতে নির্দেশ দিতেন।

যারা অপরিচ্ছন্ন থাকে, নোংরা থাকে তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। তাদের কেউ ভালোবাসে না, তাদের নানা রকম অসুখ–বিসুখ হয়।

মুখ আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই। কথা বলি। মুখ পরিষ্কার না থাকলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। মানুষ তাকে ঘৃণা করে। লোক সমাজে

লজ্জা পেতে হয়। মানুষেরও কষ্ট হয়। মহানবি (স) দুর্গন্ধযুক্ত কোনো কিছু খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন।

আমরা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাবার খাই। এতে দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা লেগে থাকে। প্রতিবার খাওয়ার পরে, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যকণা পঁচে মুখে দুর্গন্ধ হয়। দাঁতের নানা রকম রোগ হয়। দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য ওজু করার আগে মিসওয়াক করতে হয়, দাঁত মাজতে হয়। রাসুল (স) বলেছেন– "আমার উম্মাতের কষ্ট না হলে, প্রত্যেক ওজুর আগে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।

আমরা হাত দিয়ে নানা রকম কাজ করি। এতে হাত ময়লা হয়, নোংরা হয়। অনেক সময় হাতের নখ বড় হয়। বড় নখে অনেক ময়লা আটকে থাকে। আমরা হাত দিয়ে খাবার খাই। নোংরা হাতে খাবার খেলে খাবারের সাথে ময়লা পেটে চলে যায়। এতে নানা রকম পেটের অসুখ হয়। আমাদের নখ কেটে ছোট রাখতে হবে। ভালোভাবে হাত ধুয়ে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। খাওয়ার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। পায়খানা প্রস্রাব থেকে ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

রাস্তা – ঘাটে চলাফেরা করার সময় আমাদের পায়ে ধুলা–ময়লা লাগে। পা নোংরা হয়ে যায়। কাজের শেষে পা ধুয়ে–মুছে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

আমরা আমাদের শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখব, পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করব।

পরিকল্পিত কাজ : কীভাবে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, শিক্ষার্থীরা তার একটি কর্মপন্থা তৈরি করবে এবং ছুটির দিনে পরিবেশ –পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা

ধর্মীয় অনুশাসন পালনে তথা ইবাদতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। ইবাদত অনুষ্ঠানের মূল কথা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে হবে। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে সালাত, সাওম, হজ ও যাকাতের মতো মৌলিক ইবাদতগুলোও ইবাদত হিসেবে গণ্য না-ও হতে পারে, যদি ঐ ইবাদতকারীর নিয়ত অসৎ ও আল্লাহবিমুখ হয়।

আল্লাহর ইবাদত আনুগত্যের জন্য যে বিশেষ যোগ্যতা ও অনুশীলনের প্রয়োজন, তা গড়ে তোলে সালাত। সালাতের বহুমুখী শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে অন্যান্য

ইবাদত ও সৎকর্ম পালন করা সহজ হয়ে ওঠে। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সামনে চরম ও পরম দাসত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়। বিনয় ও বিনম্রতার চরম পরীক্ষার প্রমাণ পায়। সালাত হচ্ছে মুমিনের মিরাজ, আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের উপায়। সালাত যেমন পাপ মুক্ত করে, তেমনি চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে।

পক্ষান্তরে সালাতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে, লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করলে আল্লাহ তায়ালার কাছে সেই সালাতের কোনো মূল্য নেই। এই ধরনের সালাতের কোনো উপকারিতা নেই।

ধন–সম্পদের প্রতি মানুষের আর্কষণ ও ভালোবাসা একান্ত সহজাত। এ সম্পদ প্রীতি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে যেকোনো বৈধ–অবৈধ পথে সম্পদ অর্জন করতে চায়। এই সম্পদে সমাজের কোনো কল্যাণ হয় না। যাকাত ব্যবস্থার প্রধান গুরুত্ব হচ্ছে, যাকাত বিধান মানুষের মন মানসিকতার অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন করে। "সম্পদের মালিকানা আল্লাহর" এই ভাবধারার বাস্তব প্রমাণ ঘটে যাকাতে। সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ। তার বিধান অনুযায়ী সম্পদ বিতরণ করতে হবে সমাজের গরিব শ্রেণির মানুষের মধ্যে। মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে জাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এতে হৃদয়–মন থেকে কৃপণতা দূর হয়। যাকাত দানে যেমন সম্পদ পবিত্র হয়, তেমনি ব্যক্তি ও সমাজ থেকে হিংসা–বিদ্বেষ, হানাহানি দূর হয়। ধনী–গরিবের মধ্যে সেতুবন্ধন তথা সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সমাজে আর্থিক নিরাপত্তা ও ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। যাকাত দিতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর্থিক কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে। দানশীলতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সাওম পালন বা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের পাশবিকতার দমন এবং সৎ প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে। সাওম পালনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া যায়। সাওমের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন করা। এতে সবর, সহানুভূতি ও সমবেদনার অনুশীলন হয়। সাওম উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতার অনুশীলন ও পরিচর্যা।

মিথ্যা কথা অসৎকাজ ও অসৎচিন্তা ত্যাগ না করলে আল্লাহর কাছে সাওম কবুল হয় না।

আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বান্দার গভীর সম্পর্ককে মানিয়ে নেওয়ার মাধ্যম হচ্ছে হজ। একজন আল্লাহ প্রেমিক বান্দা মায়াময় জগতের আকর্ষণ ছিন্ন করে আল্লাহর সান্নিধ্যে ছুটে যায়। 'আল্লাহ আমি হাজির, আল্লাহ আমি হাজির' বলতে বলতে আল্লাহর ঘরের দোর

গোড়ায় উপনীত হয়; আল্লাহ প্রেমে সিক্ত হয়ে অন্তরের আকুল প্রার্থনা জানায়। "আমি হাজির তোমার কাছে, আল্লাহ! আমি হাজির তোমার কাছে, সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, মালিকানা ও সার্বিক ক্ষমতা তোমারই। তোমার কোনো অংশীদার নেই।"

হজের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে। আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর প্রতি ভরসা ও আত্মত্যাগের মহান শিক্ষা নিহিত রয়েছে হজের প্রতিটি কাজে। কলহমুক্ত বিশ্ব সমাজ গঠন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও আন্তর্জাতিক সমঝোতা সৃষ্টিতে হজের গুরুত্ব অপরিসীম। হজ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন। এর মাধ্যমে মহানবি (স) সাহাবা কেরাম ও পূর্ববর্তী নবিগণের স্মৃতি ও কীর্তির সাথে পরিচয় ঘটে। আবার এই হজ পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে হজের সুফল পাওয়া যায় না।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় অনুশাসন পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা না থাকলে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। অতএব আমরা পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ধর্মীয় অনুশাসনগুলো যথাযথভাবে পালন করব।

সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীল হওয়া

ইসলাম উদার মানবতা বোধসম্পন্ন, পরমত সহিষ্ণু একটি আন্তর্জাতিক জীবনব্যবস্থা। ইসলাম সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার, সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল। ইসলামে যেমন আছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় নীতিমালা, তেমনি আছে ন্যায়-নীতিভিত্তিক উদার, পরমত সহিষ্ণু, আন্তধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানবতার ঐক্য, সংহতি, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন ধর্মের এবং ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট নীতিমালা বিদ্যমান।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ মূলগতভাবে একই পিতা-মাতা আদম (আ) ও হাওয়া (আ)- এর সন্তান। যদিও পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা এসেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে মানব জাতি, আমি তোমাদের একজন নর ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বহু গোত্রে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

ইসলাম মানবতার ঐক্যে বিশ্বাস করে, বিভেদ পছন্দ করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً

অর্থ : মানুষ ছিল একই উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত (সূরা বাকারাহ – ২১৩)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) শুধু আরব দেশ, আরব জাতি বা শুধু মুসলমানদের জন্যই প্রেরিত হননি। তিনি গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরিত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির কাছেই পাঠিয়েছি।" (সূরা সাবা–৩৪:২৮)

ইসলামের মতো এমন উদারতার নজির আর কোথাও পাওয়া যাবে না। ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে :

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

অর্থ : "রাসুলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।" (সূরা বাকারাহ – ২৮৫)।

সকল রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করা মুসলিমদের ইমানের অঙ্গ। পারস্পরিক বিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা পোষণ করা সু–সম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্বশর্ত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না থাকলে সু–সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। ইসলামের সংস্কৃতি ও আচার–অনুষ্ঠানেও পারস্পরিক সু–সম্পর্ক গড়ে তোলার উপাদান পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান।

হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনায় হিজরত করেই মদিনা ও তার আশেপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সাথে একটি বিশ্বখ্যাত সনদপত্র সম্পাদন করেন, যা ইতিহাসে "মদিনার সনদ" নামে খ্যাত। এ সনদ সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জানমালের নিরাপত্তা, সকল ধর্মের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ঘোষণা ও রক্ষাকবচ। এ সনদের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা–নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার তথা মানবাধিকার স্বীকৃতিও প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুধু শান্তিকালীন নয়, যুদ্ধকালীন সময়ও ইসলাম অন্য ধর্ম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্ম যাজকদের রক্ষা নিশ্চিত করত। এদের ধ্বংস বা আক্রমণ করা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

মহানবি (স) ও মুসলিমগণ আক্রান্ত না হলে কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না। মহানবি (স) যুদ্ধের তুলনায় সন্ধি ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলাকে বেশি অগ্রাধিকার দিতেন। হুদায়বিয়ায় তিনি কাফেরদের অন্যায় আবদার মেনে নিয়েও শান্তির উদ্দেশ্যে সন্ধি করেছিলেন। তিনি হাবশার রাজা আসহাম নাজ্জাশির সাথে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁর কাছে পত্র লিখেছিলেন। তাবুক বিজয়ের পর আয়লা অধিপতি ইউহান্নার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এভাবে বাহরাইন ও নাজরানের অধিবাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন।

মহানবি (স) হিজরতের পরেই মদিনা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন গোত্র ও রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি রোম ও পারস্য সম্রাটসহ রাজন্যবর্গের কাছে উপঢৌকন পাঠাতেন এবং তাঁদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। অনেকের কাছে শান্তিদূত ও পত্র পাঠিয়েছিলেন।

পরিকল্পিত কাজ : বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামে যে নীতিমালা আছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. ইবাদত শব্দের অর্থ কী?

ক. প্রার্থনা খ. আনুগত্য

গ. দান করা ঘ. সিয়াম সাধনা।

২. ইসলাম কয়টি রুকন–এর ওপর প্রতিষ্ঠিত?

ক. তিনটি খ. চারটি

গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি।

৩. সালাতের নিষিদ্ধ সময় কয়টি?

ক. তিনটি খ. চারটি

গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি।

৪. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কত রাকআত ফরজ?

ক. পাঁচ রাকআত খ. দশ রাকআত

গ. পনের রাকআত ঘ. সতের রাকআত।

৫. সালাতের আরকান কয়টি?

ক. পাঁচটি খ. সাতটি

গ. তেরটি ঘ. পনেরটি।

৬. কাবা শরিফ কোথায় অবস্থিত?

ক. মক্কায় খ. মদিনায়

গ. জেরুজালেমে ঘ. ফিলিস্তিনে।

৭. দীন ইসলামের সেতু কী ?

ক. সালাত খ. সাওম

গ. হজ ঘ. যাকাত।

৮. হজ–এর ফরজ কয়টি

ক. তিনটি খ. চারটি

গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি।

৯. আল্লাহর কাছে কুরবানির কী পৌঁছায় ?

ক. গোশত খ. রক্ত

গ. তাক্ওয়া ঘ. চামড়া।

১০. সকল রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করা মুসলিমদের কী ?

ক. ইচ্ছাধীন খ. ইমানের অঙ্গ

গ. সৌজন্য ঘ. সুন্দর আচরণ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. ––––– ইমানের অঙ্গ।

২. সালাত দীন ইসলামের ––––– ।

৩. সালাত ––––– চাবি।

৪. ––––– মানে সংক্ষিপ্তকরণ।

৫. সালাতের ভেতরের ফরজগুলোকে ––––– বলে।

৬. ঢাকা শহরকে বলা হয় ––––– শহর।

৭. সাওমের মূল উদ্দেশ্য হলো ––––– অর্জন করা।

৮. ––––– অর্থ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ।

৯. জীবনে ––––– হজ করা ফরজ।

১০. পরস্পর সাক্ষাৎ হলে বলব ––––– ।

গ. বাম দিকের শব্দের সঙ্গে ডান দিকের শব্দের অর্থ মিলাও

বাম	ডান
ইবাদত	ক্ষমা প্রার্থনা করা
সালাত	ভ্রমণকারী
মুসাফির	বিরত থাকা
সাওম	আনুগত্য
যাকাত	নির্ধারিত পরিমাণ
নিসাব	সংকল্প করা
হজ	পবিত্রতা ও বৃদ্ধি
কুরবানি	ভেঙে ফেলা
আকিকা	উৎসর্গ

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইবাদত কাকে বলে?

২. আল্লাহ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?

৩. ইসলামের রুকন কয়টি ও কী কী?

৪. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম লেখ।

৫. সালাতের নিষিদ্ধ সময়গুলো কী কী?

৬. মুসাফির কাকে বলে?

৭. আহকাম কাকে বলে?

৮. আরকান কাকে বলে?

৯. সাওম কাকে বলে?

১০. সাওমের মাসকে ফজিলতের দিক দিয়ে কয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে?

১১. যাকাত কাকে বলে?

১২. হজ কাকে বলে?

১৩. হজের ফরজ কয়টি এবং কী কী?

১৪. কুরবানি কাকে বলে?

১৫. আকিকা কাকে বলে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন–

১. ইবাদতের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

২. সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় বর্ণনা কর।

৪. সালাতের ফজিলত ও শিক্ষা বর্ণনা কর।

৫. চার রাকআত ফরজ সালাত আদায়ের নিয়ম লেখ।

৬. সালাতের আহকামগুলো লেখ।

৭. সালাতের আরকান বলতে কী বোঝ? আরকানগুলো কী কী?

৮. সালাতের ওয়াজিবগুলো কী কী?

৯. মসজিদের আদবগুলো কী কী?

১০. সাওমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সংক্ষেপে লেখ।

১১. যাকাতের তাৎপর্য ও শিক্ষা বর্ণনা কর।

১২ যাকাতের মাসারিফ কয়টি ও কী কী, বর্ণনা কর।

১৩. হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লেখ।

১৪. হজের ফরজগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১৫. মুখ, দাঁত, হাত ও পা পরিষকার–পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

১৬. কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।

১৭. ধর্মীয় অনুশাসন পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

১৮. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার, সহিষ্ণু ও সহনশীল হওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ

আখলাক অর্থ সদাচার, চরিত্র। সুন্দর স্বভাব ও ভালো চরিত্রকে আরবিতে আখলাক বলে। চরিত্র ভালো হলে জীবন সুন্দর হয়। সুখের হয়। যার চরিত্র সুন্দর এবং আচরণ ভালো সে সদা সত্য কথা বলে, পিতামাতার কথা শোনে, শিক্ষককে সম্মান করে, সৃষ্টির সেবা করে, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করে, সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে।

আর যার চরিত্র সুন্দর নয় এবং আচরণ মন্দ সে মিথ্যা বলে, পিতামাতার অবাধ্য হয়, মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করে না, সৃষ্টির সেবা করে না ইত্যাদি। যার চরিত্র ও আচরণ সুন্দর সবাই তাকে ভালোবাসে। বয়সে বড় হলে সবাই তাঁকে সম্মান করে। শ্রদ্ধা করে। আর বয়সে ছোট হলে সবাই তাকে আদর করে। স্নেহ–যত্ন করে। সবাই বলে তার চরিত্র ভালো। সে উত্তম লোক।

মহানবি (স) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।

যার চরিত্র সুন্দর নয়, আচরণ ভালো নয়, কেউ তাকে ভালোবাসে না। শ্রদ্ধা করে না। আদর ও স্নেহ করে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে। অবিশ্বাস করে। কেউ তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে না।

আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের একটি আদর্শ কাহিনী

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র) উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ রওনা দেবেন। মা তাঁর জামার আস্তিনের মধ্যে চল্লিশটি সোনার মুদ্রা সেলাই করে দিলেন। আর রওনা দেওয়ার পূর্বে পুত্রকে বললেন, "সর্বদা সত্য কথা বলবে, কখনো মিথ্যা বলবে না।" তিনি কাফেলার সাথে বাগদাদ রওনা দিলেন। পথিমধ্যে একদল ডাকাত কাফেলার ওপর হামলা করল। ডাকাতের দল কাফেলার সকলকে একের পর এক তল্লাশি চালাল। তাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিল। তারা আব্দুল কাদির জিলানী (র)-কে জিজ্ঞাসা করল,'হে বালক! তোমার কাছে কী আছে? তিনি নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, 'চল্লিশটি সোনার মুদ্রা আছে'। ডাকাতরা ধমকের সুরে বলল, কোথায় 'সোনার মুদ্রা'? উত্তরে আব্দুল কাদির জিলানী (র) বললেন, এগুলো আমার জামার আস্তিনের মধ্যে সেলাই করা আছে।' তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা দেখে ডাকাত

দলের সরদারের বিবেক খুলে গেল। সে অনুতপ্ত হলো। তারা সকলে তওবা করল এবং সৎপথ ধরল।

এভাবে সুন্দর আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে মুক্তি দেয়। মানব সমাজ আলোর পথ পায়। বস্তুত, সুন্দর আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ মানবজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের চরিত্র সুন্দর ও আচরণ ভালো করতে হলে আমরা–

আল্লাহর ইবাদত করব, পিতামাতার কথা শুনব।

শিক্ষককে সম্মান করব, সত্য কথা বলব।

সৃষ্টির সেবা করব, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব।

মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলব।

আমরা কতগুলো মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব। যেমন–

আমরা মিথ্যা কথা বলব না, ঝগড়া–বিবাদ করব না।

হিংসা করব না, চুরি–ডাকাতি করব না।

ধূমপান করব না, দেশের ও জনগণের ক্ষতি করব না।

আল্লাহর ইবাদত ভুলব না, কটু কথা বলব না।

পরিকল্পিত কাজ : ভালো আচরণ এবং মন্দ আচরণের পৃথক পৃথক চার্ট তৈরি কর।

সৃষ্টির সেবা (خِدْمَةُ الْخَلْقِ)

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন মানুষ, জীবজন্তু , পশুপাখি, কীটপতঙ্গ। তিনি সৃষ্টি করেছেন চাঁদ–সুরুজ, গ্রহ–তারা, নদীনালা, পাহাড়–পর্বত, গাছপালা এবং আরো অনেক কিছু। আল্লাহর এই সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবার সেরা। আর তিনিএই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। তাই মানুষ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখাবে। সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। এরই নাম সৃষ্টির সেবা।

যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া দেখায় এবং সৃষ্টির সেবা করে আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি হন। তাদের ভালোবাসেন। তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন।

মহানবি (স) বলেছেন:

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَآءِ

অর্থ: "পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাদের প্রতি দয়া দেখাও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

আল্লাহর ইবাদতের পর আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের সেবা করা। আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবা করা। আমরা একে অপরের প্রতি দয়া দেখাব। সহানুভূতিশীল হব। যদি আমরা কারো প্রতি দয়া না দেখাই তাহলে আল্লাহ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। আমাদের ওপর দয়া করবেন না। মহানবি (স) বলেছেন:

لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

অর্থ: যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া দেখান না।

আমরা মানুষের সেবা করব। অসুস্থ ব্যক্তির সেবাযত্ন করব। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেব। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করব। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেব। দরিদ্র ও ভিক্ষুককে সাহায্য করব। বেকার লোকদেব কাজের ব্যবস্থা করে দেব। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী বিপদে পড়লে সাহায্য-সহযোগিতা করব। মহানবি (স) বলেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা কর এবং বন্দীকে মুক্তি দাও।"

শুধু মানুষ নয়, সকল জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালাসহ আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবা করব। গরু-ছাগল, কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেব না। প্রহার করব না। এদের যত্ন করব। কোনো জীবজন্তু বিপদে পড়লে তাকে উদ্ধার করব। তাকে বাঁচাব। আর এ সবই নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত।

হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, "একদা এক মহিলা পথের পাশে দেখতে পান যে, একটি কুকুর পিপাসায় খুবই কাতর। আর্তনাদ করছে। এখনই মারা যাবে এমন অবস্থা। মহিলার দয়া হলো। তিনি কাছেই একটি কূপ দেখতে পেলেন এবং কূপ থেকে পানি আনলেন। কুকুরের মুখের সামনে পানি ধরলেন। পানি পান করে কুকুরটি আরাম পেল। সে প্রাণে বেঁচে গেল।

মহিলা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া দেখালেন। কুকুরটিকে সেবা করলেন। এজন্য আল্লাহ ঐ মহিলার প্রতি খুশি হলেন। তার জীবনের সব পাপ ক্ষমা করে দিলেন।"

একটি আদর্শ কাহিনী

ফুয়াদ পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। একদিন সে স্কুলে যাওয়ার পথে একটি গরুর গাড়ি দেখল। গাড়িতে মালামাল বোঝাই খুব বেশি। এদিকে গাড়ির চাকা খাদে পড়ে গেছে। গরু খাদ থেকে গাড়িটি টেনে তুলতে পারছে না। গরুর খুব কষ্ট হচ্ছে। গরুর কষ্ট দেখে ফুয়াদের খুব কষ্ট হলো। তার দয়া হলো। সে গাড়ির গাড়োয়ানকে সাহায্য করল। গাড়িটি ঠেলে খাদ থেকে রাস্তার ওপরে উঠিয়ে দিল।

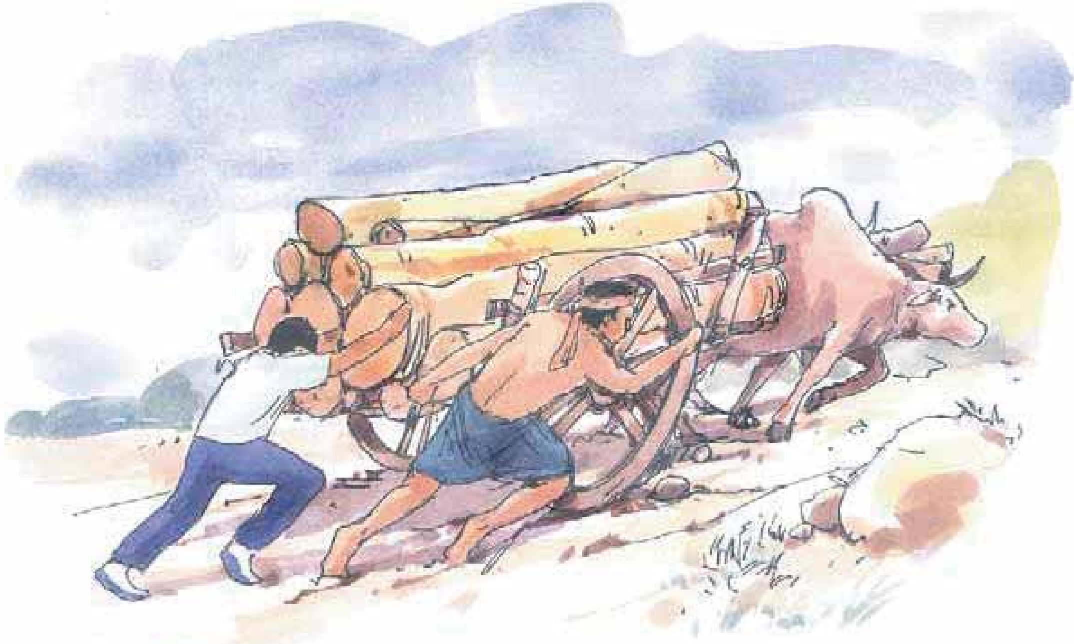

বোঝাই গাড়ি ঠেলে তুলছে

অতপর সে গাড়োয়ানকে বলল, চাচাজান, গরু–মহিষ তাদের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারে না। বেশি বোঝা চাপালে এদের খুব কষ্ট হয়। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। গুনাহ হয়। গাড়োয়ান ফুয়াদের ব্যবহারে খুব খুশি হলো। সে ফুয়াদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করল।

আমাদের মহানবি (স) সৃষ্টির সেবার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষের সুখ–দুঃখের খোঁজখবর নিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় মসজিদে সকলের খোঁজখবর নিতেন। তিনি শুধু মানব জাতির কল্যাণকামী ছিলেন না বরং আল্লাহর সকল

সৃষ্টির প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি সারা জীবন সৃষ্টির সেবা করে গেছেন। এ জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বা 'সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন

পরিকল্পিত কাজ : কী কী উপায়ে সৃষ্টির সেবা করা যায় তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

দেশপ্রেম অর্থ দেশকে ভালোবাসা, স্বদেশকে ভালোবাসা, জন্মভূমিকে ভালোবাসা। নিজের দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার নামই দেশপ্রেম।

আমাদের মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি মক্কা নগরীকে খুব ভালোবাসতেন। মক্কার লোকজনকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। তিনি মক্কাবাসীকে সত্য ও ন্যায়পথে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তারা মহানবি (স)–এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তারা তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজের জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

হিজরতের সময় মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি মক্কানগরী ছেড়ে যেতে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন। খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় অশ্রুভেজা চোখে বারবার মক্কার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর কাতরকণ্ঠে বলছিলেন:

"হে মক্কানগরী, তুমি কতো সুন্দর!

তুমি আমার জন্মভূমি, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তুমি আমার কাছে কতই না প্রিয়!

হায়! আমার স্বজাতি যদি ষড়যন্ত্র না করত,

এদেশ থেকে আমাকে তাড়িয়ে না দিত

আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।"

স্বদেশের প্রতি মহানবি (স)-এর কী গভীর ভালোবাসা! কী মধুর টান! কী অটুট দেশপ্রেম।

আমাদের জন্মভূমি এই বাংলাদেশ। আমাদের স্বদেশ এই বাংলাদেশ। আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই বাংলাদেশকে ভালোবাসব। প্রাণের চেয়েও ভালোবাসব। দেশের সকল সম্পদকে ভালোবাসব ও যত্ন করব। দেশের সম্পদ সংরক্ষণ করব। আর এগুলো করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

জাওয়াদের আব্বার নাম আব্দুল্লাহ আল মামুন। জাওয়াদ তার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করল: আমরা দেশকে কীভাবে ভালোবাসব, বাংলাদেশকে কীভাবে ভালোবাসব আব্বু!

জাওয়াদের আব্বু উত্তরে বললেন, আমরা এভাবে দেশের সেবা করে দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি :

ক. দেশের সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করব, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করব।

খ. গৃহপালিত পশুপাখির যত্ন নেব, তাদের কোনো কষ্ট দেব না।

গ. বৃক্ষরোপণ করব, ফলমূলের গাছ লাগাব, গাছ নষ্ট করব না, পাতা ছিঁড়ব না। ডাল ভাঙব না।

ঘ. বেঞ্চে, দেয়ালে বা অন্য কোথাও আজেবাজে কিছু লিখব না, সবকিছু পরিচ্ছন্ন রাখব, সংরক্ষণ করব।

ঙ. পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস অপচয় করব না, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করব।

চ. দেশকে ভালোবাসব, দেশের মানুষকে ভালোবাসব, সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

তাই তো জ্ঞানীরা বলেছেন : حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ

অর্থ : দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

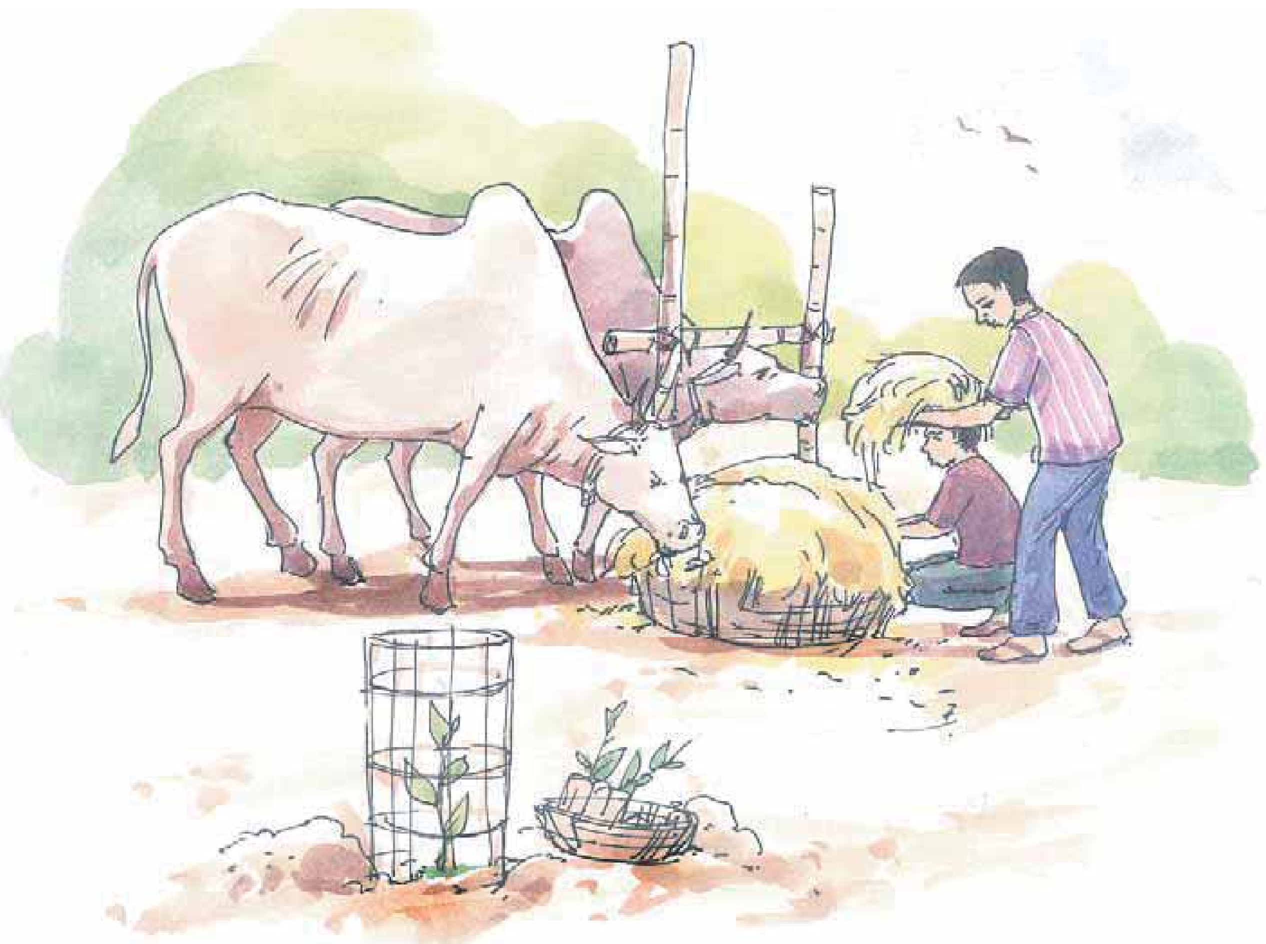

জীবে দয়া ও বৃক্ষরোপণ

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা কীভাবে দেশপ্রেম গড়ে তুলবে, তার একটি চার্ট খাতায় লিখবে।

ক্ষমা (اَلْعَفْوُ)

ক্ষমা আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণ। মানুষ ভুল করে। অন্যায় করে। গুনাহ করে। মানুষ অন্যায়-অপরাধ করার পর যদি অনুতপ্ত হয়, তাহলে আল্লাহ নিজগুণে অনুতপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেন। যদি তিনি মানুষের অপরাধ ও গুনাহ ক্ষমা না করতেন, তাহলে কোনো গুনাহগার ব্যক্তি তার শাস্তি থেকে রেহাই পেত না। আল্লাহ ক্ষমা পছন্দ করেন।

আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি যেমন মানুষকে ক্ষমা করে দেন, তেমনি মানুষের কর্তব্য অন্য অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ বলেন, "যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং লোকদেরকে

ক্ষমা করে, এরূপ নেক বান্দাদের আল্লাহ ভালোবাসেন।”

ক্ষমা করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। যার মন উদার, মানুষের জন্য যার দয়ামায়া বেশি, যে রাগ দমন করতে পারে, সেই ক্ষমাশীল হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে সকলেই ভালোবাসে। আল্লাহও ভালোবাসেন। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন: 'যে ক্ষমা করল, ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে দিল, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার রয়েছে।'

একটি আদর্শ কাহিনী

আমাদের মহানবি (স)-এর সারা জীবনই ছিল ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি ছিলেন মানব জাতির পরম বন্ধু। কাফেররা তাঁর ওপর নির্মম অত্যাচার করত। তাঁকে মক্কা ছাড়তে বাধ্য করল। তিনি আল্লাহর নির্দেশে জীবন রক্ষার্থে এবং ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফে গমন করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন পালিত পুত্র যায়িদ (রা)। তায়েফবাসী তাঁর ইসলাম প্রচার শোনল না। তারা তাঁকে লাঞ্ছিত করল। তারা পাথরের আঘাতে তাঁকে এবং যায়িদ (রা) কে রক্তাক্ত করল। আল্লাহর রহমতে তাঁরা দুজনে রক্তাক্ত অবস্থায় তায়েফ থেকে ফিরে আসলেন। কিন্তু তবুও দয়ার নবি (স) তায়েফবাসীদের জন্য বদদোয়া করলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তারা অবুঝ, তারা কিছুই বোঝে না। তুমি তাদের ক্ষমা কর।'

মহানবি (স) তাঁর প্রাণের শত্রুদের হাতের মুঠোয় পেয়েও কোনো দিন তাদের ওপর প্রতিশোধ নেননি। তিনি হাসিমুখে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মহানবি (স)-এর প্রেম ও ক্ষমার আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মক্কাবাসী স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এভাবে মহানবি (স)-এর ক্ষমার আদর্শে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মক্কানগরী তাওহিদের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীগণ শ্রেণিকক্ষে ক্ষমার গুরুত্ব সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করবে এবং সকলে ক্ষমার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানবে। সকলে ক্ষমা করা শিখবে এবং ক্ষমা করবে।

ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া

ছোট–বড় যত সদাচার এবং সৎ কাজ– এ সবই ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, গরিব ও দুঃস্থদের জন্য সেবা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, তাদের স্বাবলম্বনের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট মেরামত ও তৈরি করা। এসব ভালো কাজে একে অপরের সহযোগিতা করতে হয়। যদি এলাকায় রাস্তাঘাট না থাকে তাহলে যাতায়াত ও চলাফেরার খুব অসুবিধা হয়। খাল ও পানির নালার উপরে পুল ও সাঁকো না থাকলে যাতায়াতের সমস্যা হয়। তাই সকলে মিলে রাস্তাঘাট, পুল ও সাঁকো তৈরি করব। একে অপরকে সাহায্য–সহযোগিতা করব। তাহলে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা হয় না।

চিত্র : সমবায়ের ভিত্তিতে সাঁকো তৈরি করছে

কাজটা সুন্দর হয়। গ্রাম ও মহল্লার সকলে মিলেমিশে ভালো কাজ করলে গ্রাম ও মহল্লাটি সুন্দর হয়। একটি আদর্শ গ্রাম ও মহল্লা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কথায় বলে–

সবে মিলে করি কাজ

হারি জিতি নাহি লাজ।

আমরা ময়লা–আবর্জনা ফেলার একটি নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করব। সকলে ডাস্টবিন অথবা নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলব। আমরা সকলে মিলে একটি ছোটখাটো গ্রন্থাগার গড়ে তুলব। অবসর সময়ে সেখানে গিয়ে বই পড়ব। আমরা সকলে মিলে রাস্তার পাশে বা ফাঁকা স্থানে গাছ লাগাব। ফুল ও সবজির বাগান করব। এগুলোর যত্ন নেব। যেখানে–সেখানে পেশাব–পায়খানা করা উচিত নয়। আমরা সবাই মিলে প্রত্যেক পরিবারের জন্য দু-একটি করে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন তৈরি করব। আমরা মাঝে মাঝে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা অভিযানে বড়দের সাথে অংশ নেব। বড়দের সাহায্য করব। আমরা লেখাপড়ার পাশাপাশি এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেব। পরিবার, বিদ্যালয় ও এলাকার উন্নতি করব।

খারাপ ও অসৎ কাজই মন্দ কাজ। কোনো কিছু চুরি করা, ছিনতাই করা, ঝগড়া ও মারপিট করা ইত্যাদি মন্দ কাজ। এসব মন্দ কাজে কখনো একে অপরের সাহায্য–সহযোগিতা করা উচিত নয়। মন্দ কাজে বাধা দিতে হয়। যদি আমাদের কোনো সহপাঠী বই, খাতা কিম্বা পেন্সিল চুরি করে, শ্রেণিকক্ষের মধ্যে হৈ চৈ ও গন্ডগোল করে, কোনো কিছু দিয়ে বেঞ্চের কোনা কাটে, দেয়ালে কালির দাগ দেয়,তাহলে আমরা এসব মন্দ কাজে তাকে বাধা দেব। এগুলো করতে নিষেধ করব। যদি সে আমাদের নিষেধ না শোনে তাহলে শিক্ষকের কাছে তার এসব মন্দ আচরণের কথা জানাব। শিক্ষক তাকে এসব মন্দ কাজ করতে বিরত রাখবেন। সংশোধন করে দেবেন। বাধা দেবেন।

সব ভালো কাজে সহযোগিতা করা এবং সব মন্দ কাজে বাধা দেওয়া ইসলামের নির্দেশ এবং নৈতিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। মহানবি (স) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখে তাহলে সে যেন নিজের শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেয়। আর যদি সে শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দিতে অপারগ হয়,তাহলে উপদেশের মাধ্যমে যেন তাকে সংশোধন করে। আর যদি তাও না পারে,তাহলে সে যেন তার প্রতি ঘৃণা করে। আর এটাই দুর্বল ইমানের পরিচয় ।’

আমাদের মহানবি (স) ও তাঁর সাহাবিগণ সর্বদা ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদান করতেন। ফলে তাঁদের সমাজ অত্যন্ত সুন্দররূপে গড়ে উঠেছিল। কেউ ভুলে অথবা গোপনে মন্দ কাজ করলে সে নিজেই অনুতপ্ত হতো। লজ্জা পেত। মহানবি (স)–এর কাছে চলে আসত। নিজের পাপের কথা স্বীকার করত। তওবা করত।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তোমরা ভালো ও সৎকাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর। আর মন্দ ও পাপ কাজে একে অপরকে অসহযোগিতা কর।'

আমরা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলব। মহানবি (স)–এর উপদেশ মানব। ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করব। কেউ মন্দ কাজ করলে তাকে বাধা দেব। মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখব। সুন্দর পরিবেশ গড়ব। সুন্দর সমাজ গড়ব। সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গড়ব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা ভালো কাজের এবং মন্দ কাজের একটি তালিকা পাশাপাশি খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

সততা

সততা মানে সাধুতা, মানবতা, সত্যবাদিতা। নিজের স্বার্থ বড় করে না দেখা এবং অপরের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হোক তা না চাওয়ার নামই সততা। যার মধ্যে এই মহৎ গুণটি রয়েছে, তাকে সৎ ব্যক্তি বলা হয়। যার মধ্যে সততা আছে, সে ন্যায়নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে। তার মধ্যে মানবতাবোধ থাকবে। সে সর্বদা সত্য কথা বলবে এবং মানুষের বিশ্বাস অর্জন করবে। এমনকি তার চরম শত্রুরাও তাকে বিশ্বাস করবে। সততা মানুষকে ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করে। আর ভালো কাজ মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। তাই ইসলাম আমাদের কথাবার্তায়, কাজকর্মে ও আচার–আচরণে সততা রক্ষা করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে।

অপরপক্ষে যে সমাজে সততার অভাব রয়েছে, সেখানে সুখ ও শান্তি নেই। সেখানে অশান্তি আর অশান্তি। সেখানে বদনাম বিরাজ করে। অসত্য এবং সততার অভাব মানুষকে সমাজে হেয় করে তোলে। যে সমাজে সত্যবাদিতা ও সততার অভাব ঘটে সে

সমাজ আস্তে আস্তে ধ্বংসের পথে চলে যায়। ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতারণা ও দুর্নীতি সে সমাজকে আচ্ছন্ন করে। মহানবি (স) বলেছেন.

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ

অর্থ : সততা ও সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয় আর অসত্য ও মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।

সততা সম্পর্কে আমরা একটি আদর্শ কাহিনী জানব

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন হযরত ওমর (রা)। তিনি তাঁর রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ন্যায় বিচার করতেন। কোনো প্রকার অন্যায় কাজ হলে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা নিতেন। ছোট-বড়, আপন-পর, ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য সমান বিচার হতো। বিচারে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব হতো না। তিনি রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে মদিনার অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নিতেন। তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতেন।

এক রাতে তিনি মদিনার পথে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুঁড়েঘরের কাছে আসলেন। ঐ ঘরে এক দরিদ্র মা ও তার মেয়ে বসবাস করতেন। তিনি মা ও মেয়ের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। দুধ বিক্রি করে তাদের সংসার চলত। মা তার মেয়েকে সকালে দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দুধের পরিমাণ বাড়াতে বলল। মেয়েটি তার মায়ের কথা শুনে অনুরোধ করে বলল, মা এটা অন্যায় কাজ। যদি খলিফা এই অন্যায় জানতে পারেন তাহলে কঠিন শাস্তি দিবেন। মা বললেন এ কাজ তো খলিফা বা তাঁর লোকজন দেখতে পারবে না। জানতেও পারবেন না। মেয়েটি তার মাকে বলল খলিফা ওমর বা তাঁর লোকজন এ অন্যায় না দেখতে পেলেও স্বয়ং আল্লাহতো সবকিছু দেখছেন। তাঁর চোখ কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন।

হযরত ওমর (রা) মা ও মেয়ের এসব কথাবার্তা শুনে বাড়িতে ফিরে গেলেন। তিনি মেয়েটির সততায় খুবই খুশি ও মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর যোগ্য ও স্নেহের পুত্রের সাথে ঐ দরিদ্র মহিলার সৎ কন্যার বিয়ে দিলেন। এই মেয়েটিই হলেন খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র)-এর নানি।

আমাদের মহানবি (স)-এর চরিত্রে এই সততা গুণটি পরিপূর্ণভাবে ছিল। তাঁর চরম শত্রুরাও এই সততার কারণে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। তাঁর প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে যেদিন শত্রুরা

তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল সেদিনও তাঁর কাছে বহু লোকের অর্থ-সম্পদ আমানত ছিল। তিনি কারো কোনো অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করেননি। নষ্টও করেননি। আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় তিনি আমানতের সব অর্থ-সম্পদ হযরত আলী (রা)-এর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা) সেগুলো নিজ নিজ মালিককে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এটাই সততার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত ।

পরিকল্পিত কাজ : সততা কাকে বলে, শিক্ষার্থী খাতায় সুন্দর করে বুঝিয়ে লিখবে।

পিতামাতার খেদমত

এই পৃথিবীতে পিতামাতার চেয়ে আপনজন আমাদের আর কেউ নেই। পিতামাতার ওছিলাতেই আমরা দুনিয়াতে এসেছি। তাঁদের স্নেহ ও আদরে আমরা লালিত-পালিত এবং বড় হয়েছি। তাঁরা ভালোবাসা ও মমতা দিয়ে আমাদের বড় করে তোলেন। শিশুকালে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন। আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে অনেক সেবাযত্ন করেন। আমাদের আনন্দে তাঁরা আনন্দ পান। আমাদের দুঃখ-কষ্টে তাঁরাও দুঃখ-কষ্ট পান। তাঁরা সব সময় আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন। আমাদের সুস্থতা ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী পিতামাতার প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

আমরা সবসময় পিতামাতার খেদমত করব। পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করব। তাঁদের আদেশ-নিষেধ শুনব এবং মেনে চলব। তাঁদের সম্মান দেখাব। তাঁদের সেবাযত্ন করব। তাঁরা অসুস্থ হলে সেবা করব। চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তাঁরা যাতে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখব। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থ: তোমরা পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

আমরা পিতামাতার মনে সামান্যতম কষ্ট দেব না। দুঃখ দেব না। তাঁদের সামনে গালিগালাজ করব না। তাঁদের কটু কথা বলব না এবং গালি দেব না । তাঁদের মন্দ বলব না। তিরস্কার করব না। তাঁদের সাথে খারাপ ব্যবহার করব না। আমরা তাঁদের

সামনে বা অগোচরে এমন কথা বলব এবং এমন কাজ করব যা তাঁরা দেখলে বা শুনলে খুশি হন। তাঁরা খুশি হলে আল্লাহও আমাদের ওপর খুশি হবেন । মহানবি (স) বলেছেন–

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

অর্থ: পিতার সন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি।

পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে সন্তানের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এসময়ে যাতে তাঁদের সামান্যতম দুঃখ–কষ্ট ও অসুবিধা না হয়,সেদিকে সব সময় খেয়াল রাখব। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে দান–খয়রাত করব। তাঁদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বদা নিম্নোক্ত দোয়া করব:

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيْرًا

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! পিতামাতা আমাকে যেমন শৈশবে স্নেহ–যত্নে লালন–পালন করেছেন, আপনি তাঁদের প্রতি ঠিক তেমনি দয়া করুন।

এখন আমরা পিতামাতার খেদমতের ব্যাপারে একটি আদর্শ কাহিনী জানব :

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) ইরানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আম্মাকে সব সময় খেদমত করতেন। সেবাযত্ন করতেন। তাঁর আম্মাও তাঁকে খুবই আদর–স্নেহ করতেন। একদা তাঁর আম্মা অসুস্থ ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের কাছে পানি চাইলেন। পুত্র বায়েজিদ আশেপাশে কোথাও পানি পেলেন না। অবশেষে নদী থেকে পানি আনলেন। পানি নিয়ে আসতে একটু দেরি হয়েছে। তাঁর আম্মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। শীতের সময় ছিল তখন। বায়েজিদ (র) ভাবলেন আম্মাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে উঠালে তিনি কষ্ট পাবেন। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হবে, তাই তিনি সারারাত পানির পাত্র হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কনকনে শীত। শীতে তার হাত অবশ হয়ে আসছিল। কিন্তু তবু তিনি আম্মাকে ডাকলেন না । ঘুম ভাঙালেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন।

শেষ রাতে আম্মার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। শিয়রে তাঁর ছেলেকে পানির পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি অবাক হলেন এবং খুব খুশি হলেন। তিনি প্রাণভরে ছেলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ মায়ের দোয়া কবুল করলেন। পরবর্তীতে ছেলেটি আল্লাহর বিশ্ববিখ্যাত ওলি বায়েজিদ বোস্তামী নামে

পরিচিত হলেন। আর এটাই নৈতিক মূল্যবোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

সন্তান মায়ের সেবায় পানির পাত্র হাতে অধির আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে

এভাবে পিতামাতার খেদমত করলে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়। পিতামাতার খেদমত ও সেবাযত্নের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের চরম সুখশান্তি। মহানবি (স) বলেছেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

অর্থ: মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা পিতামাতার খেদমত সম্পর্কে জানবে। পরস্পর আলোচনা করবে এবং খাতায় লিখবে।

শ্রমের মর্যাদা

শ্রম অর্থ মেহনত, পরিশ্রম, চেষ্টা, খাটুনি। আমরা সবাই শ্রম দিই। চেষ্টা করি, কেউ চাকরিতে শ্রম দিই, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রম দিই। কেউ চাষাবাদে শ্রম দিই। কেউ লেখাপড়ায় শ্রম দিই। কেউ খেলাধুলায় শ্রম দিই। চেষ্টা ও শ্রম সাফল্যের চাবিকাঠি।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰي

অর্থ : মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়।

ফুয়াদ পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সে রোজ সকালে ঘুম থেকে ওঠে। মেসওয়াক করে। হাতমুখ ধুয়ে ওজু করে। ফজরের সালাত আদায় করে। কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করে। অতঃপর তার আম্মুর কাছে পড়তে বসে। সে প্রতিদিনের পড়া তৈরি করে নিয়ে স্কুলে যায়। শিক্ষক ক্লাসে পড়ার মধ্য থেকে তাকে কোনো প্রশ্ন করলে সে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয়। শিক্ষক তার ওপর খুব খশি হন। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা পড়াশোনায় শ্রম ও মনোযোগ দিলে সবাই পড়া শিখতে পারবে। প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। চেষ্টা ও পরিশ্রমই শেখার ও জানার চাবিকাঠি।

আমরা অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে লজ্জাবোধ করি। মনে করি যে, কাজ করলে লোকে ঘৃণা করবে। চাকর বলবে। কিন্তু এ রকম মনে করা ঠিক নয়। কারণ আমরা সবাই শ্রম দিই। আমরা সকলে শ্রমিক। দেশের ছোট–বড় শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই শ্রম দেন এবং বিনিময়ে অর্থ উপাজন করেন। তাই কোনো শ্রম বা শ্রমিককে ঘৃণা করতে নেই। প্রত্যেক শ্রমিককে তার শ্রমের মর্যাদা দিতে হবে। তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তাকে স্নেহ ও আদর করতে হবে।

আমাদের মহানবি (স) সব সময় নিজের কাজ নিজে করতেন। তিনি কখনো কাজে অবহেলা করতেন না। কোনো কাজকে ঘৃণা করতেন না। কাজ ফেলে রাখতেন না। অপরের কাজে সাহায্য–সহযোগিতা করতেন। তিনি ছেঁড়া জামা–কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। ময়লা জামা–কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। ঘর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতেন। পানাহারের প্লেট–গ্লাস নিজেই ধুতেন। বাসায় মেহমান আসলে তাকে যত্ন করতেন। তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো নিজ হাতে সব কাজ করতেন। আনন্দ পেতেন। মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে বলেছেন, 'যারা কাজ করে, তারা তোমাদের ভাই। নিজে যা খাবে, তাদের তা খাওয়াবে। নিজে যা পরিধান করবে তাদেরও তা পরতে দেবে। কাজকর্মে তাদের সাহায্য করবে। তাদের বেশি কষ্ট দেবে না। তাদের মর্যাদা করবে। তাদের শ্রমের মর্যাদা দেবে ।'

আমাদের অনেকের বাসায় গরিব অসহায় লোকজন ও মহিলারা নানা রকম কাজকর্ম করে থাকে। ছোট ছোট বিভিন্ন বয়সের গরিব ছেলেমেয়েরা কাজকর্ম করে। আমরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। কাজের লোকজন বয়সে বড় হলে তাদের সালাম দেব। সম্মান করব। মর্যাদা দেব। আর বয়সে ছোট হলে তাদের আদর করব। যত্ন নেব। নিজেরা যা খাব, তাদেরও তাই খেতে দেব। তাদের কাজে সাহায্য করব। তাদের কোনো কষ্ট দেব না। তাদের দুঃখ দেব না। তারা আমাদের মতো মানুষ। তারা আমাদের ভাইবোন। আমাদের যেমন মানমর্যাদা আছে, তাদের তেমনি মানমর্যাদা আছে। আমরা তাদের সম্মান করব। তাদের কাজের ও শ্রমের মর্যাদা দেব। আর এই শ্রমের মর্যাদা দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

পৃথিবীতে কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। কোনো কর্মী ও শ্রমিক নগণ্য নয়। প্রত্যেক কর্মী ও শ্রমিকের হাতই উত্তম হাত। শ্রমের উপার্জনই উত্তম উপার্জন। শ্রমিকের কাজ শেষ হলে তার পারিশ্রমিক সাথে সাথেই দিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে শ্রমের ন্যায্য মর্যাদা দেওয়া হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। এটাই নৈতিক মূল্যবোধ।

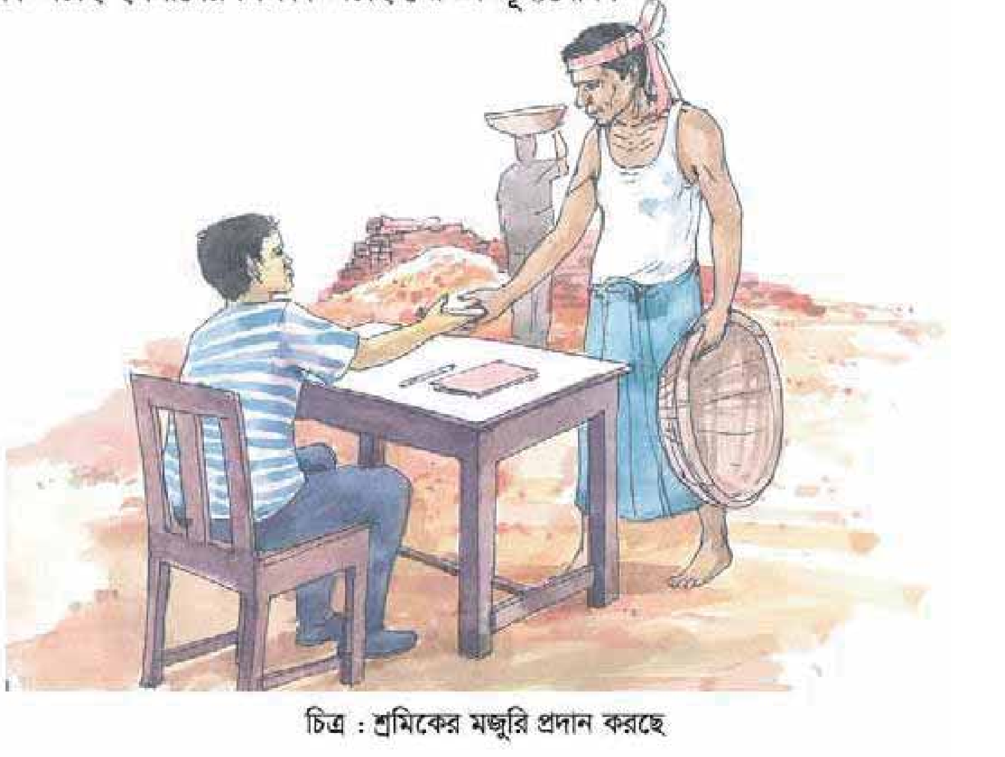

চিত্র : শ্রমিকের মজুরি প্রদান করছে

মহানবি (স) বলেছেন, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।'

পরিকল্পিত কাজ : আমরা নিজেদের কাজ নিজেরা করলে আমাদের মর্যাদা বাড়বে, না কমবে? শিক্ষার্থীরা এ প্রশ্নের উত্তরটি খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব

মানুষের অধিকারকে মানবাধিকার বলা হয়। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বৃদ্ধ-যুবক ও শিশু সবাই একসাথে বসবাস করে। আবার এদের মধ্যে অনেকে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও ইয়াতীম। এরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকে। এসব মানুষের অধিকার রয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সব মানুষ এক ও অভিন্ন। ভাষা, বর্ণ, বংশ ও অঞ্চলবিশেষে মানুষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সবাই মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। সকলেই সমান। সকলের সমান অধিকার রয়েছে। ইসলাম সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার দান করেছে।

ইসলামপূর্ব যুগে মানুষ বেচাকেনা হতো। তারা কেনা গোলামের ওপর নির্মম অত্যাচার করত। কেনা গোলামের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। সে বেতনও পেত না। মালিকের খেয়াল-খুশিমতো তাকে চলতে হতো। মালিক তার ওপর নির্মম অত্যাচার করলেও সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারত না। সব অত্যাচার সহ্য করতে হতো। এহেন কেনা গোলামের সাথে মহানবি (স) এবং সাহাবিগণ অত্যন্ত মধুর আচরণ করেছেন। হযরত বেলাল (রা) এবং আরও অনেক কেনা গোলামকে তাঁরা মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন হযরত খাদিজা (রা)-এর কেনা গোলাম। মহানবি (স) তাঁকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন এবং তাঁকে সেনাপতির পদ দান করেছিলেন। এভাবে ইসলাম মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর এটাই নৈতিক মূল্যবোধের অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

মানবাধিকার সম্পর্কে একটি আদর্শ কাহিনী

একদিন মহানবি (স) দেখলেন যে রাস্তার ওপর একটি বালক শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। তার পরনে ছিল ছেঁড়া নোংরা জামা-কাপড়। মাথায় ছিল ভারী লাকড়ির বোঝা। তাকে দেখে মহানবি (স)-এর মনে দয়া হলো। তিনি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে বালকটির পিতামাতা নেই। সে রোজ জঙ্গল থেকে লাকড়ি কুড়িয়ে আনে। আর তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বালকটির কষ্টের কাহিনী শুনে মহানবি (স)-এর

চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বালকটিকে আদর করলেন এবং তাকে সাথে নিয়ে বাড়িতে আসলেন। তিনি বালকটিকে হযরত খাদিজা (রা)–এর কাছে দিয়ে বললেন, 'বালকটি ইয়াতীম, তুমি একে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহযত্ন দিয়ে লালন–পালন করবে।' মহানবি (স) এভাবে বালকটিকে আশ্রয় দিয়ে মানবাধিকারের আদর্শ স্থাপন করেছেন।

পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ) এবং মাতা হাওয়া (আ)। আমরা সকলে আদম (আ) এবং হাওয়া (আ)–এর সন্তান। অতএব, আমরা সকল মানুষ ভাই ভাই। মানব জাতি হযরত আদম (আ)–এর বংশধর। আস্তে আস্তে এই মানব জাতি পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং বসবাস করছে। এদের আকৃতি ও বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। তবুও এরা ভাই ভাই। বিশ্বের সকল মানুষ ভাই ভাই। এরা সবাই আদম (আ) হতে সৃষ্ট।

আমরা বর্ণ–গোত্রনির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ও কলহ–বিবাদ ভুলে যাব। বিশ্বের সবাই ভাই ভাই হিসেবে মিলেমিশে বসবাস করব। সকল দুর্নীতি ও বৈষম্য দূর করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হব। আর কোনো হিংসাবিদ্বেষ করব না। কারো কোনো অনিষ্ট করব না। একে অপরের উপকার করব।

মহানবি (স) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকে আদম (আ) হতে, আর আদম (আ) মাটি হতে (সৃষ্ট)।'

আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ব। মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করব। সোনার বাংলাদেশ গড়ব। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা মানবাধিকার এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

পরিবেশ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে এই সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়-পর্বত- এ সবকিছুই আমাদের পরিবেশ। এগুলোকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। তা ছাড়া ঘরবাড়ি, মসজিদ, মন্দির, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো মানুষ তৈরি করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এসব পরিবেশের প্রয়োজন।

পরিবেশ সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ পরিবেশ আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করে। বড় বড় গাছ কেটে আমরা দরজা, জানালা, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরি করি। তা ছাড়া লাকড়ি হিসেবেও ব্যবহার করি। পশুপাখির মাংস আমরা খাই। গাভী আমাদের দুধ দেয়। আমাদের সুস্থ শরীরের জন্য বায়ুর প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া করি। মসজিদে আমরা ইবাদত করি। সালাত আদায় করি। পুকুর নদী ও জলাশয় থেকে আমরা মাছ পাই। রাস্তাঘাট আমাদের চলাচলের প্রধান ব্যবস্থা। মাঠে আমরা খেলা করি। এ জন্য পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করব। পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণ করবে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

ক) বৃক্ষ রোপণ করবে। বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করা যাবে না। গাছের ডালপালা ভাঙা যাবে না। গাছের পাতা ছেঁড়া, নষ্ট করা যাবে না।

খ) অকারণে পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ হত্যা করা যাবে না।

গ) যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা যাবে না।

ঘ) যেখানে-সেখানে কফ, থুথু এবং ময়লা-আবর্জনা ফেলা যাবে না। নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।

ঙ) গাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করে। তাই যেখানে-সেখানে কলকারখানা নির্মাণ করা যাবে না।

চ) পুকুরে গরু-মহিষ গোসল করালে পানি দুর্গন্ধ ও দূষিত হয়। এতে পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই পুকুরে গরু-মহিষ গোসল করানো যাবে না।

ছ) ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ ও রাস্তাঘাট সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক কোনো দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় যখন কোনো জনপদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে,তখন তাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হঠাৎ করে আসে। এর ওপর সাধারণত মানুষের কোনো হাত থাকে না। যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, সুনামি, আইলা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশের অনেক ক্ষতি হয়। যেমন, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে সমুদ্রের লোনা পানি ঢুকে যায়। ফলে গাছপালা, মৎস্যখামার ও শস্যক্ষেতের অনেক ক্ষতি হয়। জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়। কৃষিজমির ক্ষতি হয়। জমির উর্বরা শক্তি কমে যায়। কৃষি উৎপাদন কমে যায়।

সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনপদ

আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আইলা ও সিডরের নাম শুনেছি। এ দুটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের

কারণে আমাদের অনেক প্রাণহানি হয়েছে। অনেক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। খাওয়ার পানির খুব অভাব দেখা দিয়েছিল। সুন্দরবনের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ অংশ বন নষ্ট হয়েছে। নানা প্রকার মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা, খরা ও ভূমিকম্পের ফলে অনেক ঘরবাড়ি নষ্ট হয়। মানুষের বেঁচে থাকা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময় আমরা

গাছের শিকড় দ্বারা মাটির ক্ষয়রোধ

সেবা-শুশ্রূষার মতো কার্যক্রম চালাব। এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াব। যেভাবে পারি তাদের সেবা, সহায়তা করব। এটাই হলো ইসলাম ও নৈতিকতার শিক্ষা।

বাংলাদেশের লোকজন যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে আছে। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করব:

ক) যথাসম্ভব উঁচু জায়গায় বসতভিটা, গোয়ালঘর ও হাঁসমুরগির ঘর তৈরি করব।

খ) ঘরের ভেতরে উঁচু মাচা তৈরি করে তার উপর খাদ্যশস্য, বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ করব।

গ) পুকুরের পাড় উঁচু করব। টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন যথাসম্ভব উঁচু স্থানে বসাব।

ঘ) শুকনো খাবার যেমন চিঁড়া, মুড়ি, গুড় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ ঘরে মজুদ রাখব।

ঙ) পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সাতারকাটা শেখাব।

চ) বন্যার সময়ে যাতায়াতের জন্য নৌকা না থাকলে কলাগাছের ভেলা তৈরি করে নেব।

তাহলে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে নিজে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পরিকল্পিত কাজ :

ক) শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়গুলো খাতায় লিখবে।

খ) শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার কৌশলগুলো খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও:

১. আখলাক অর্থ কী?

ক) আচরণ খ) সদাচার

গ) সুন্দর ঘ) উত্তম।

২. আমরা বেকার লোকদের কিসের ব্যবস্থা করে দেব?

ক) কাজের খ) সেবার

গ) মুক্তির ঘ) বস্ত্রের।

৩. দেশপ্রেম অর্থ কী?

ক) দেশের গান করা খ) দেশে বাস করা

গ) দেশকে দেখা ঘ) দেশকে ভালোবাসা।

৪. মহানবি (স) কোথায় হিজরত করেছিলেন?

ক) কুফায় খ) তায়েফে

গ) মদিনায় ঘ) মিশরে।

৫. মানুষ অন্যায় করার পর অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে কী করেন?

ক) স্মরণ করেন খ) ক্ষমা করেন

গ) শাসন করেন ঘ) ত্যাগ করেন।

৬. ভালো কাজে একে অপরকে কী করবে?

ক) ধমক দেবে খ) মারবে

গ) শাসন করবে ঘ) সহযোগিতা করবে।

৭. সততা মানে কী?

ক) ধৈর্যধারণ খ) সরলতা

গ) সাধুতা ঘ) বিরোধিতা।

৮. হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?

ক) ইরান খ) ইরাক

গ) মিশর ঘ) লিবিয়া।

৯. মানুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়, এটি কার উক্তি?

ক) মানুষের খ) ফেরেশতার

গ) মহানবি (স)-এর ঘ) আল্লাহর।

১০. মানুষের অধিকারকে কী বলা হয়?

ক) মানবতা খ) মানবাধিকার

গ) মানবধর্ম ঘ) মানব জাতি।

১১. প্রাকৃতিক পরিবেশ কোনটি?

ক) জানালা খ) দালান

গ) দরজা ঘ) গাছপালা।

১২. কোনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়?

ক) বন্যা খ) ভূমিকম্প

গ) অগ্নিকাণ্ড ঘ) ঘূর্ণিঝড় ।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর?

১) যার আচরণ ভালো সে সকলের সাথে ভালো ---- করে।

২) মানুষ আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি ----- দেখাবে।

৩) দেশপ্রেম ----- অঙ্গ।

৪) হিজরতের সময় মহানবি (স) তাঁর জন্মভূমি -----অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন।

৫) সততা মানুষকে ------ দেয়।

৬) মায়ের --- নিচে সন্তানের জান্নাত।

৭) চেষ্টা ও শ্রম ——— চাবিকাঠি।

গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলো মিলাও:

বাম	ডান
১) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই লোক, যার চরিত্র	দয়া দেখান না
২) যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না আল্লাহ তার প্রতি	পুরস্কার রয়েছে
৩) আমাদের জন্মভূমির নাম	ময়লা ফেলব
৪) যে ক্ষমা করল তার জন্য আল্লাহর কাছে	সহযোগিতা করবে
৫) আমরা সকলে ডাস্টবিনে	সবচেয়ে সুন্দর
৬) তোমরা ভালো কাজে একে অপরকে	বাংলাদেশ

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. মহানবি (স) সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে কী বলেছেন?

২. 'সৃষ্টির সেবা' কাকে বলে?

৩. মহানবি (স) মক্কাবাসীদের কিসের আহ্বান জানিয়েছিলেন?

৪. ক্ষমাশীল ব্যক্তি কে?

৫. মন্দ কাজ কাকে বলে?

৬. যার মধ্যে সততা আছে, তাকে কী বলে?

৭. আমরা পিতামাতার সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

৮. আমরা পিতামাতার জন্য কী বলে দোয়া করব?

৯. আমরা বাসার কাজের লোকদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করব?

১০. মহানবি (স) শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে কী বলেছেন?

১১. মানব জাতির আদিপিতা ও আদিমাতা কে কে ছিলেন?

১২. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১. আমরা কোন কোন মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকব?

২. আমরা কীভাবে মানুষের সেবা করব?

৩. কী কী উপায়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়?

৪. মহানবি (স)–এর জীবনের ক্ষমার একটি আদর্শ কাহিনী উল্লেখ কর।

৫. আমরা ভালো কাজে কীভাবে সাহায্য করব?

৬. মন্দ কাজ সম্পর্কে মহানবি (স) কী বলেছেন?

৭. হযরত উমর (রা)–এর সততার পরিচয় দাও।

৮. আমরা পিতামাতার খিদমত করব কেন?

৯. মহানবি (স) চাকরদের সম্পর্কে কী বলেছেন?

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা কী কী কৌশল অবলম্বন করব?

চতুর্থ অধ্যায়

কুরআন মজিদ শিক্ষা

কুরআন মজিদের পরিচয়

কুরআন মজিদ আল্লাহ্ তায়ালার কালাম। কালাম অর্থ বাণী। আল্লাহ তায়ালা এই কালাম মহানবি (স)–এর কাছে নাজেল করেন। আমাদের মহানবি (স) হলেন সর্বশেষ নবি ও রাসুল। আর কুরআন মজিদ হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

পবিত্র কুরআন যেমন নাজেল হয়েছিল, তেমনি আছে। এ কিতাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি আর কোনো দিন কোনো প্রকার পরিবর্তন হবেও না।

আল্লাহ পাক বলেন, আমি কুরআন মজিদ নাজেল করেছি আর এর হেফাজতকারীও আমি।

মানুষের ভালো হওয়ার এবং কল্যাণ লাভের সব কথা, সব নিয়ম–নীতি আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে ঘোষণা করেছেন। কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো চারটি।

১. সহিহ–শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা,

২. এর অর্থ বোঝা,

৩. আল্লাহ পাক যা আদেশ করেছেন তা পালন করা,

৪. আল্লাহ পাক যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।

মহানবি (স)–এর সাথীগণ এ উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতেন। আর এতে যা নির্দেশ রয়েছে তা পুরোপুরি মেনে চলতেন এবং যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতেন। ফলে তাঁরা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একক কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য কী এর একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে সুন্দর করে লিখবে।

বোঝে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে আমরা জানতে পারব আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, নবি–রাসুলগণের পরিচয়, ফেরেশতাগণের পরিচয়, পরকালের পরিচয়। আমরা আরো জানতে পারব আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে। আমাদের রিজিকদাতা কে। কে আমাদের পালনকর্তা। কে সর্বশক্তিমান। কে সবকিছুর মালিক। কে পরম দয়ালু। কে একমাত্র শান্তিদাতা।

আমরা আরও জানতে পারব আমাদের কাজকর্ম কিরূপ হওয়া উচিত। আমাদের চরিত্র কিরূপ হওয়া দরকার। আমরা এ দুনিয়ায় কার হুকুম মানব আর কার হুকুম মানব না। কিসে আমাদের সম্মান ও সফলতা আর কিসে আমাদের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা।

পরিকল্পিত কাজ : কুরআন মজিদ বোঝে তিলাওয়াত করলে কী কী জানতে পারব তার একটি তালিকা শিক্ষার্থীরা তৈরি করবে।

তাজবিদ (اَلتَّجْوِيْدُ)

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কুরআন মজিদের ভাষা আরবি। সঠিক উচ্চারণে আমাদের কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা শিখতে হবে। সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তায়ালার কালামের অর্থ ঠিক থাকে। সালাত শুদ্ধ হয়। সঠিক ও শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে না পারলে আল্লাহর কালামের অর্থ ঠিক থাকে না। সালাত শুদ্ধ হয় না। পাপ হয়।

শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের নিয়মকে তাজবিদ বলে। তাজবিদে থাকে মাখরাজ, ইদগাম, গুন্নাহ ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ।

মাখরাজ (اَلْمَخْرَجُ)

আরবি শব্দ উচ্চারণের সময় মুখের এক এক জায়গা থেকে এক একটি হরফ উচ্চারিত হয়। কখনো জিহ্বা, কখনো তালু, কখনো দাঁত, কখনো ঠোঁট, কখনো কণ্ঠনালি– নানা স্থান থেকে হরফ উচ্চারণ করা হয়।

আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে বলে মাখরাজ। কোনো হরফকে সাকিন করে ডানে একটি হরতকবিশিষ্ট আলিফ বসিয়ে উচ্চারণ করলে সাকিন হরফটির আওয়াজ যে স্থানে

গিয়ে থেমে যায় তা হলো ঐ হরফের মাখরাজ বা উচ্চারণের স্থান। যেমন,

১. اَبْ = আলিফ বা যবর আব। এখানে বা বর্ণের উচ্চারণের সময় আওয়াজ দুই ঠোঁটে এসে থেমে গেছে। কাজেই ب বর্ণের মাখরাজ দুই ঠোঁট।

২. اَخْ = আলিফ খা যবর আখ। এখানে خ বর্ণের উচ্চারণে আওয়াজ থেমে গেছে কণ্ঠনালিতে। কাজেই خ বর্ণের মাখরাজ কণ্ঠনালি। এমনিভাবে আরবি ২৯টি বর্ণ ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এই স্থানগুলো হলো নাসাগহ্বর, মুখগহ্বর, জিহ্বা, তালু, আলজিহ্বা, কণ্ঠনালির শুরু, কণ্ঠনালির মধ্যভাগ, কণ্ঠনালির শেষ অংশ, ওপরের ঠোঁট, সামনের ওপরের দুটি দাঁত, সামনের নিচের দুটি দাঁত, ডান দিকের ওপরের মাড়ির দাঁত, বাম দিকের ওপরের মাড়ির দাঁত ইত্যাদি।

১. কণ্ঠনালির শুরু থেকে উচ্চারিত হয় ء – ه

২. কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয় ع – ح

৩. কণ্ঠনালির শেষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয় غ – خ

৪. জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ق

৫. জিহ্বার গোড়ার কিছুটা সামনের অংশ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ك

৬. জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ج – ش – ى । উল্লেখ্য যে, জিহ্বার মাঝ অংশ তিন ভাগে বিভক্ত। গোড়ার ভাগে ج তারপর ش তারপর ى উচ্চারিত হয়।

৭. জিহ্বার গোড়ার কিনারা, ওপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ض

৮. জিহ্বার অগ্রভাগের কিনারা সামনের ওপরের দাঁতের সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় د ذ

৯. জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ن

১০. জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ر

১১. াগ ওপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ط د ت

১২. ি সামনের নিচের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ص س ز

১৩. াগ সামনের ওপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ظ ذ ث

১৪. নিচের ঠোঁটের ভেজা অংশ সামনের ওপরের দুই দাঁতের সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় ف

১৫. দুই ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয় و ب م

১৬. মুখের খালি জায়গা থেকে মাদ্দ–এর হরফ উচ্চারিত হয় بَا بُوْ بِيْ

১৭. নাকের গহ্বর থেকে গুন্নাহ উচ্চারিত হয় م ن

কাজ : শিক্ষার্থীরা কোন কোন স্থান থেকে আরবি ২৯ টি বর্ণ উচ্চারিত হয় তা দলে আলোচনা করে একটি তালিকা তৈরি করবে। এরপর মার্কার দিয়ে পোস্টার পেপারে লেখবে।

ওয়াক্ফ বা বিরামচিহ্ন

কুরআন মজিদ শুদ্ধ তিলাওয়াতের জন্য আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের বিরামচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন জায়গায় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবে তা নির্দেশ করা হয়েছে। এ বিরামচিহ্নকে ওয়াক্ফ বলা হয়।

বিরামচিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, একজন আরবি না জানা লোকও যেন সহজে বুঝতে পারেন কোথায় কতটুকু থামতে হবে আর কোথায় থামলে অর্থ ঠিক থাকবে না। আগে কুরআন মজিদে এই চিহ্নগুলো দেওয়া ছিল না। যিনি সর্বপ্রথম এ চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন তার নাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে তাইফুর।

ওয়াক্ফ বা বিরামচিহ্নের বিবরণ:

○ = একে 'ওয়াক্ফ তাম' বলে। আয়াতের শেষে এ চিহ্ন থাকে। যেখানে শুধু এ চিহ্ন থাকে সেখানে আমরা অবশ্যই থামব। কিন্তু এর ওপর অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে তখন আমরা সে অনুযায়ী আমল করব।

م = একে 'ওয়াক্ফ লাজিম' বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্ফ করা আবশ্যক, না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط = একে 'ওয়াক্ফ মুতলাক' বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি উত্তম।

ج = একে 'ওয়াক্ফ জায়েজ' বলে। এখানে থামা ও না থামা উভয় অনুমতি আছে। তবে থামাই ভালো।

ز = একে 'ওয়াক্ফ মুজাওয়াজ' বলে। এখানে না থামাই ভালো ।

ص = একে 'ওয়াক্ফ মুরাখখাস' বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভালো । তবে দমে না কুলালে থামা যায়।

ق = এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ আছে। থামবে না।

قف = এখানে থামা উচিত।

لا = এখানে থামা যাবে না। আয়াতের মাঝখানে থাকলে থামা যাবে না। আর আয়াতের শেষে গোল চিহ্নের ওপর থাকলে থামা যাবে।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা দলেবলে ওয়াক্ফ বা বিরাম চিহ্নের বিবরণসহ একটি তালিকা তৈরি করে পোস্টার পেপারে লিখবে।

গুন্নাহ اَلْغُنَّةُ

কুরআন মজিদ সহীহ-শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের একটি নিয়ম হলো গুন্নাহ। নাক ব্যবহার করে উচ্চারণ করাকে গুন্নাহ বলে।

আরবি হরফ ২৯টি। এর মধ্যে গুন্নাহর হরফ ২টি। م (মিম), ن (নুন)। এই হরফ দুটি যখন তাশদীদযুক্ত হয়, তখন তার উচ্চারণ স্বরকে নাকের বাঁশির মধ্যে নিয়ে গুন গুন করে উচ্চারণ করতে হয়। গুন্নাহ করা ওয়াজিব। গুন্নাহর স্থলে কমপক্ষে এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করতে হয়। যেমন,

اِنَّ (ইন্না), عَمَّ (আমমা), ثُمَّ (সুমমা) ইত্যাদি।

কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে গুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা তিলাওয়াতের সময় যথাস্থানে গুন্নাহ করব।

সূরা ফীল (سُوْرَةُ الْفِيْلِ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মক্কী সূরা, আয়াত সংখ্যা– ৫

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝
وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ
مَّاْكُوْلٍ ۝

বাংলা উচ্চারণ:

১. আলাম তারা কাইফা ফায়ালা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফীল। ২. আলাম ইয়াজয়াল কাইদাহুম ফি তাদলিল। ৩. ওয়া আরসালা আলাইহিম তায়রান আবাবিল। ৪. তারমিহিম বিহিজারাতিম মিন সিজ্জিল। ৫. ফাজায়ালাহুম কাআসফিম মা'কুল।

অর্থ : ১. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের প্রতি কী করেছিলেন?

২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি?

৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন।

৪. যারা তাদের ওপর কঙ্কর নিক্ষেপ করে।

৫. এরপর তিনি তাদের চর্বিত ঘাসের মতো করে দেন।

সূরা কুরাইশ (سُوْرَةُ قُرَيْشٍ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মক্কী সূরা, আয়াত সংখ্যা– ৪

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا

الْبَيْتِ ۝ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

বাংলা উচ্চারণ:

১. লি ঈলাফি কুরাইশীন।

২. ঈলাফিহিম রিহলাতাশ শিতায়ি ওয়াসসায়্যিফ।

৩. ফালইয়াবুদু রাব্বা হাজাল বায়তিল্লাজী।

৪. আতয়ামাহুম মিন জুয়েঁও ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ।

অর্থ :

১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে।

২. আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।

৩. তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের।

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন।

সূরা মাউন (سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

মক্কী সূরা, আয়াত সংখ্যা– ৭

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ

سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

বাংলা উচ্চারণ:

১. আরাইতাল্লাযী ইউকাজ্জিবুবিদ্দীন। ২. ফাজালিকাল্লাযী ইয়াদুউল ইয়াতীম। ৩. ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তায়ামিল মিসকীন। ৪. ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন। ৫. আল্লাযিনা হুম আন সালাতিহিম সাহূন। ৬. আল্লাযিনা হুম ইউরাউন। ৭. ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন।

অর্থ : ১. তুমি কি দেখেছ তাকে যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে?

২. সে তো সেই যে, এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় ।

৩. এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।

৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের।

৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।

৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।

৭. গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।

সূরা কাউসার (سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ○

বাংলা উচ্চারণ :

১. ইন্না আতাইনা কালকাওসার।

২. ফাসাল্লি লি রাব্বিকা ওয়ানহার।

৩. ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার।

অর্থ : ১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার দান করেছি।

২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর ।

৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ ।

সূরা কাফিরুন (سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝

وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

বাংলা উচ্চারণ:

১. কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন। ২. লা আবুদু মা তাবুদুন। ৩.ওয়ালা আনতুম আবিদূনা মা আবুদ। ৪. ওয়া লা আনা আবিদুম মা আবাততুম। ৫. ওয়া লা আনতুম আবিদূনা মা আবুদ। ৬. লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ : ১. বল, হে কাফিরগণ!

২. আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর ।

৩. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি ।

৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ।

৫. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।

৬. তোমাদের দীন তোমাদের, আর আমার দীন আমার জন্য।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১) কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয়–

ক. ء ـ ه   খ. غ ـ خ

গ. ع ـ ح   ঘ. ف

২) কণ্ঠনালির শেষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয়–

ক. ع ـ ح   খ. غ ـ خ

গ. ج ـ ش ـ ى   ঘ. ء ـ ه

৩) জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ل   খ. ك

গ. ت   ঘ. ض

৪) জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের নিচের দুই দাঁতের অগ্রভাগে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ط د ت   খ. ص س ز

গ. ء ـ ه   ঘ. ف

৫) জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ء ـ ه   খ. ق

গ. غ ـ خ   ঘ. ك

৬) জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ج ـ ش ـ ى খ. ر

গ. ط د ت ঘ. ص س ز

৭) জিহ্বার অগ্রভাগ ওপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়–

ক. ظ ذ ث খ. ن

গ. ص س ز ঘ. ط د ت

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কুরআন মজিদ আল্লাহর .... ।

২. জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চারিত হয় .... ।

৩. ع ـ ح কণ্ঠনালির .... থেকে উচ্চারিত হয়।

৪. বিরাম চিহ্নকে .... বলে।

৫. কুরআন মজিদের ভাষা............ ।

গ. বাম পাশের কথাগুলোর সাথে ডান পাশের কথাগুলো মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য	আসমানি কিতাব
কুরআন মজিদ হলো সর্বশেষ	৪টি
দুই ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হয়	ق
জিহ্বার গোড়া তালুর সাথে লাগিয়ে উচ্চরিত হয়	ء ـ ه
কণ্ঠনালির শুরু থেকে উচ্চারিত হয়	و ب م

সংক্ষিপ্ত উত্তরপ্রশ্ন

১. কুরআন মজিদ পাঠের উদ্দেশ্য কয়টি?

২. মাখরাজ কয়টি?

৩. কণ্ঠনালির হরফ কয়টি?

৪. ظ ذ ث কোথা থেকে উচ্চারিত হয়?

৫. দুই ঠোঁট থেকে কোন কোন হরফ উচ্চারিত হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কুরআন মজিদ কার বাণী? কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য কয়টি ও কী কী?

২. কুরআন মজিদ বুঝে তিলাওয়াত করলে কী কী বিষয়ে জানতে পারবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

৩. তাজবিদ কাকে বলে? সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করার কী কী লাভ আছে উল্লেখ কর।

৪. মাখরাজ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

৫. কোন কোন স্থান থেকে আরবি বর্ণগুলো উচ্চারিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

৬. কণ্ঠনালি থেকে কোন কোন বর্ণ উচ্চারিত হয় তা লিখ।

৭. জিহ্বা থেকে যেসব বর্ণ উচ্চারিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

৮. ওয়াক্‌ফ কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কী? সর্বপ্রথম কে এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন?

৯. ওয়াক্‌ফে তাম, লাজিম ও মুতলাকের চিহ্নগুলো অঙ্কন কর।

১০. সূরা ফীলের অর্থ লিখ।

১১. সূরা আল কাওসার আরবিতে লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়

মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়

আমরা আগেই জেনেছি, আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা নিজেরা আল্লাহর হুকুম পালন করে মানুষদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানুষের মহান ও আদর্শ শিক্ষক। নবি-রাসুলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী, নির্লোভ ও নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন দয়ালু ও মানব-দরদী। তাঁরা আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার দীন প্রচারে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবি হযরত আদম (আ) আর সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)। এ অধ্যায়ে আমরা মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ; কুরআন মজিদে উল্লিখিত ২৫ জন নবির নাম এবং কয়েকজন নবির পরিচয় জানবো।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ

মহানবি (স)-এর জন্ম ও পরিচয়

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল এবং রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা। তাঁর দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্তালিব। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ এবং আহমাদ। তাঁর জন্মের পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান।

আরবের অবস্থা

মহানবি (স)-এর জন্মের সময় আরবের লোকেরা নানা পাপের কাজে লিপ্ত ছিল। মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, মদ, জুয়া ইত্যাদি নিয়েই তারা মেতে ছিল। এক আল্লাহকে ভুলে তারা নানা দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। পবিত্র কাবা তারা মূর্তিতে ভরে রেখে ছিল। কাবা প্রাঙ্গণে তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তখন বাজারে পণ্যের মতো মানুষ বেচাকেনা হতো।

মনিবরা দাস–দাসীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন করত। পরিবারে ও সমাজে নারীদের কোনো মান–সম্মান বা অধিকার ছিল না। সে সময় কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ করা পিতা–মাতার জন্য খুবই অপমানের বিষয় ছিল। মেয়ে শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হতো। তাদের আচার–আচরণ ছিল বর্বর ও মানবতা বিরোধী। এ সময়ে মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। মদপান, জুয়াখেলা, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার লোকদের নিত্য–নৈমিত্তিক ব্যাপার। কুসংস্কার ও পাপ–পঙ্কিলতার অতলতলে নিমজ্জিত ছিল তারা। সে সময়কে বলা হয় 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বা মূর্খতার যুগ। মানবতার এ চরম দুর্দিনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বন্ধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (স) কে পাঠালেন বিশ্বমানবতার শান্তিদূত হিসেবে। পথহারা মানুষকে সত্য, সুন্দর, ধর্ম ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য।

শৈশব ও কৈশোর

হযরত মুহাম্মদ (স)–এর জন্মের পর চাচা আবু লাহাবের দাসী সোয়েবা তাঁকে মাতৃস্নেহে লালন–পালন করেন। তারপর তখনকার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের প্রথা অনুসারে বানু সাদ গোত্রের বেদুঈন মহিলা হালিমার হাতে তাঁর লালনপালনের ভার দেওয়া হয়। সোয়েবা যদিও তাঁকে অল্পদিন লালন–পালন করেছেন তবুও তিনি প্রথম দুধমাতা ও তাঁর পরিবারের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ ছিলেন। অনেকদিন পরেও তাঁদের খোঁজ–খবর নিয়েছেন এবং উপহার উপঢৌকন দিয়েছেন। পাঁচ বছর পর্যন্ত বিবি হালিমা নিজের সন্তানের মতো শিশু মুহাম্মদ (স) কে লালনপালন করেন। এ সময় শিশু মুহাম্মদ (স)–এর চরিত্রে ইনসাফ ও ত্যাগের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। তিনি হালিমার একটি স্তন থেকে দুধ পান করতেন, অন্যটি দুধ ভাই আবদুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন। তিনি বেদুঈন পরিবারে থেকে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখেন ও মরুভূমির মুক্ত পরিবেশে সু– স্বাস্থ্যের অধিকারী হন।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি মা আমিনার কোলে ফিরে আসেন। আদর–সোহাগে মা তাঁকে লালনপালন করতে থাকেন। কিন্তু মায়ের আদর তাঁর কপালে বেশি দিন স্থায়ী হলো না। তাঁর ছয় বছর বয়সে মাও এন্তেকাল করেন। এবার তিনি পিতামাতা দুজনকেই হারিয়ে এতিম হয়ে যান। এরপর তিনি দাদা আব্দুল মুত্তালিবের আদর–স্নেহে লালিত–পালিত হতে থাকেন। কিন্তু আট বছর বয়সের সময় তাঁর দাদাও মারা যান। এরপর তিনি চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন।

আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না। কিশোর মুহাম্মদ (স) ছিলেন কর্মঠ। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি চাচার অসচ্ছল পরিবারে নানাভাবে সাহায্য করতেন। বাড়তি আয়ের জন্য রাখালদের সাথে ছাগল-মেষ চড়াতেন। রাখাল বালকদের জন্য তিনি ছিলেন আদর্শ। তাদের সাথে তিনি সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় রাখতেন। রাখালদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হলে তিনি বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন। তিনি চাচার ব্যবসা-বাণিজ্যেও সাহায্য করতেন। একবার চাচার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায়ও গিয়েছিলেন। এ সময় বহীরা নামক এক পাদ্রির সাথে তাঁর দেখা হয়। বহীরা তাঁকে অসাধারণ বালক বলে মন্তব্য করেন এবং শেষ নবি বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি আবু তালিবকে তাঁর ব্যাপারে সাবধানও করেন। কারণ শত্রুরা তাঁর অনিষ্ট করতে পারে।

সিরিয়া থেকে ফেরার পর বালক মুহাম্মদ (স) ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে আঁতকে ওঠেন। ওকায মেলায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে এ যুদ্ধ হয়েছিল। কায়াসগোত্র অন্যায়ভাবে এ যুদ্ধ কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। এজন্য একে 'হারবুল ফিজার' বা অন্যায় সমর বলা হয়। এ যুদ্ধ চলে একটানা পাঁচ বছর। অনেক মানুষ আহত-নিহত হলো। যুদ্ধের বিভীষিকাময় করুণ দৃশ্য দেখে, আহতদের করুণ আর্তনাদে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।

তিনি শান্তিকামী উৎসাহী যুবক বন্ধুদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযূল' নামে একটি শান্তি সংঘ গঠন করলেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আর্তের সেবা করা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখা ইত্যাদি। তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক সফলতা লাভ করেন। সেদিনকার শান্তি সংঘের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আজও আমাদের কিশোর ও যুব সমাজ নিজেদের এ ধরনের মহৎ কাজে নিয়োজিত করতে পারে।

ইতোমধ্যেই সত্যবাদী, বিশ্বাসী, আমানতদার, বিচক্ষণ, পরোপকারী, শান্তিকামী যুবক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আপন-পর সকলেই তাঁকে "আস সাদিক' মানে সত্যবাদী, 'আল-আমীন' মানে বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করল। তাঁর কাছে ধন-সম্পদ আমানত রাখতে লাগল।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

বহুদিন পূর্বের নির্মিত পুরাতন কাবাঘর সংস্কারের কাজ হাতে নিল কুরাইশরা। যথারীতি

কাবাঘর পুনর্নির্মাণও করল তারা। কিন্তু পবিত্র হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর স্থাপন নিয়ে বিবাদ লেগে গেল। প্রত্যেক গোত্রই এ পাথর কা'বার দেয়ালে স্থাপনের সম্মান নিতে চাইল। যুদ্ধের সাজ সাজ রব পড়ে গেল। অবশেষে প্রবীণতম গোত্র প্রধান উমাইয়া বিন মুগীরার প্রস্তাব অনুসারে সিদ্ধান্ত হলো, আগামীকাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সবার আগে কা'বা ঘরে আসবেন তাঁর ওপরই বিবাদ মীমাংসার ভার অর্পিত হবে। তাঁর সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নিবে। প্রত্যুষে দেখা গেল– হযরত মুহাম্মদ (স) কা'বায় প্রবেশ করছেন। সবাই আনন্দে চিৎকার করে বলল– 'আল–আমীন' আসছেন, আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। সঠিক মীমাংসাই হবে। মুহাম্মদ (স) একখানা চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর চাদরে নিজ হাতে পাথরখানা রাখলেন। গোত্র সরদারগণকে ডেকে চাদর ধরতে বললেন। তারা ধরে তা যথাস্থানে বহন করে নিয়ে গেল। 'আল–আমীন' নিজের হাতে পাথরখানা কা'বার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। একটি অনিবার্য যুদ্ধ থেকে সবাই বেঁচে গেল। পাথর উঠাবার সম্মান পেয়ে সবাই খুশিও হলো। বিচার ফয়সালার বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলে সমাজে শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক অনিবার্য সংঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

হযরত খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহ

তখনকার দিনে আরবে একজন বিখ্যাত ধনী ও বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁর নাম খাদিজা। তিনি তাঁর বিশাল বাণিজ্য দেখাশুনা করার জন্য একজন বিশ্বাসী বিচক্ষণ লোক খুঁজছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স)–এর সুন্দর চরিত্রের সুনাম শুনে তিনি তাঁর ওপর ব্যবসায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। মুহাম্মদ (স) খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান। সাথে খাদিজার বিশ্বস্ত কর্মচারী মাইসারাও ছিলেন। ব্যবসায়ে আশাতীত লাভ করে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। মাইসারার কাছে হযরত মুহাম্মদ (স)–এর সততা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার কথা শুনে খাদিজা অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুহাম্মদ (স)–এর চাচা আবু তালিব হযরত মুহাম্মদ (স)–এর সাথে খাদিজার বিয়ের সকল ব্যবস্থা করে দেন। শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো, তখন মুহাম্মদ (স)–এর বয়স পঁচিশ বছর। আর খাদিজার বয়স চল্লিশ বছর। তাঁদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। হযরত খাদিজা বেঁচে থাকতে তিনি অন্য কোনো বিয়ে করেননি। বিয়ের পরে খাদিজার আন্তরিকতায় তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হন। কিন্তু তিনি এ সম্পদ ভোগ–বিলাস ও আরাম–আয়েশে ব্যয় না করে গরিব–দুঃখী ও আর্ত–পীড়িতদের সেবায় অকাতরে ব্যয় করেন।

নবুয়ত লাভ

হযরত মুহাম্মদ (স) শিশু বয়স থেকেই মানুষের মুক্তির জন্য, শান্তির জন্য ভাবতেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর এ ভাবনা আরও গভীর হয়। মূর্তি পূজো ও কুসংস্কারে লিপ্ত এবং নানা দুঃখকষ্টে জর্জরিত মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর সব ভাবনা। মানুষ তাঁর স্রষ্টাকে ভুলে যাবে, হাতে বানানো মূর্তির সামনে মাথা নত করবে, এটা হয় না। কী করা যায়, কীভাবে মানুষের হৃদয়ে এক আল্লাহর ভাবনা জাগানো যায়। কী করে কুফর শিরক থেকে তাদের মুক্ত করা যায়। এ সকল বিষয়ের চিন্তা-ভাবনায় তিনি মগ্ন। বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে নির্জন হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে ধ্যান করতেন। কখনো কখনো একাধারে দুই-তিন দিনও সেখানে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধ্যানমগ্ন থাকার পর অবশেষে চল্লিশ বছর বয়সে রমযান মাসের কদরের রাতে আঁধার গুহা আলোকিত হয়ে উঠল।

হেরা গুহা

আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর মহান বাণী ওহি নিয়ে আসলেন। মহানবি (স) কে লক্ষ্য করে বললেন–‘ইকরা’ পড়ুন। তিনি মহানবি (স) কে সূরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন –

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔

اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَ كْرَمُ ۔ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۔ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ

مَالَمْ يَعْلَمْ ۔

বাংলা উচ্চারণ :

ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম। আল্লামাল ইনসানা মা–লাম ইয়ালাম।

অর্থ : ১. পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক (এঁটে থাকা বস্তু) থেকে।

৩. পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক তো মহিমান্বিত।

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে– যা সে জানতো না। (সূরা আলাক : ১ –৫)

নবিজি ঘরে ফিরে খাদিজার কাছে সব ঘটনা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, “আমাকে বস্ত্রাবৃত্ত করো, আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।” তখন খাদিজা নবিজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “না, কখনও না। আল্লাহর কসম! তিনি কখনও আপনার অনিষ্ট করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়– স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, আর্ত–পীড়িত ও দুস্থদের সাহায্য করেন, মেহমানদের সেবা–যত্ন করেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য করেন।” হযরত খাদিজার এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত লাভের আগেও মহানবি (স) নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মানবিক মহৎ গুণাবলির অনুশীলন করতেন, মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। বর্বর আরবদের মধ্যে থেকেও তিনি নির্মল ও সুন্দর জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ।

ইমানের দাওয়াত

নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর নির্দেশে প্রথমে নিকট আত্মীয়– স্বজনের কাছে গোপনে ইমানের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর দাওয়াতে সর্ব প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর সুখ–দুঃখের অংশীদার সতী–সাধ্বী স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা)। এরপর তাঁদের

পরিবারভুক্ত হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়দ (রা) ইবন হারিসা ইসলাম গ্রহণ করেন। পরিবারের বাইরে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবুবকর (রা)। তিনি ছিলেন রাসুল (স)–এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পেয়ে তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এতে মূর্তি পূজারীরা তাঁর ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। তাঁর ও তাঁর সাহাবিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা মহানবি (স) কে নানা রকম প্রলোভনও দেখাতে থাকে। নেতৃত্ব ও ধন–সম্পদ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। রাসুল (স) স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেন, "আমার এক হাতে সূর্য, আর এক হাতে চাঁদ এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না।"

তিনি বললেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। ইবাদত করতে হবে একমাত্র তাঁরই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি আরও বললেন, তোমাদের হাতে বানানো দেবদেবীর ও প্রতিমার কোনো ক্ষমতা নেই। এদের ভালোমন্দ করার কোনো শক্তিই নেই। আসমান–জমিন, চন্দ্র–সূর্য, গ্রহ–নক্ষত্র সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, পালনকারী ও রিজিকদাতা। তিনিই আমাদের জীবন–মৃত্যুর মালিক। সুতরাং দাসত্ব, আনুগত্য ও ইবাদত করতে হবে একমাত্র তাঁরই।

তিনি আরও বললেন, তোমরা সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পথে ফিরে এসো। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জুয়া, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা এসবই পাপের কাজ। সুতরাং এগুলো পরিহার করো। কারো প্রতি অন্যায়–অবিচার করবে না। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না। অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হরণ করবে না। কারো প্রতি জুলুম করবে না।

মহানবি (স) আরও বোঝালেন, তোমাদের দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। মৃত্যুর পরে আরও এক জীবন আছে, তাকে বলে পরকাল। সে জীবন অনন্ত কালের। পরকালে আল্লাহর দরবারে দুনিয়ার ভালোমন্দ সব কাজের জন্য হিসাব দিতে হবে।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ ও রাসুলের কথা মানবে, ভালো কাজ করবে, পরকালে তারা মুক্তি পাবে। চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভ করবে। আর যারা আল্লাহ ও রাসুলের কথা মানবে না, মন্দ কাজ করবে, তারা চরম শাস্তির স্থান জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন

নবুয়তের দশম বছরে মহানবি (স)–এর প্রিয়তমা সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা) ও তাঁর স্নেহপরায়ণ চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন। এতে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে

পড়েন। সীমাহীন শোক ও কাফেরদের অকথ্য অত্যাচারের মুখেও তিনি দীন প্রচার করতে থাকেন। তিনি মক্কাবাসীদের থেকে এক রকম নিরাশ হয়েই দীন প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করেন। সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণতো করলই না, বরং তারা প্রস্তরাঘাতে মহানবি (স)–এর পবিত্র শরীর ক্ষত–বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে ছাড়ল। মহানবি (স) এমন সময়ও তায়েফবাসীদের জন্য বদদোয়া করলেন না। বরং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। ইতিহাসে এমন ক্ষমার দৃষ্টান্ত বিরল।

মিরাজে গমন

মক্কার কাফেরদের সীমাহীন অত্যাচার ও তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারে মহানবি (স) অত্যন্ত মর্মাহত ও ব্যথিত। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। তিনি মিরাজে গমন করলেন। তিনি আল্লাহ পাকের দিদারে ধন্য হলেন। নবুয়তের একাদশ সনে রজব মাসের ২৭ তারিখে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)–কে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করিয়ে আনেন। একেই বলে মিরাজ।

বায়তুল মুকাদ্দাস

এই ভ্রমণে বায়তুল মুকাদ্দাসে তিনি পূর্ববর্তী নবিগণের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। সেখান থেকে সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করেন। তিনি আল্লাহর নিকট থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ

পান। মিরাজ মহানবি (স)-এর জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এতে তিনি নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে পূর্ণ উদ্যমে দীন প্রচার করতে থাকেন। এই সফরে জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন করে অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

মদিনায় হিজরত

৬২১ খ্রিস্টাব্দে হজের মৌসুমে মদিনা থেকে ১২ জন লোকের একটি দল মক্কায় আসেন এবং গোপনে মহানবি (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী বছর ঐ সময় মদিনা থেকে ২ জন মহিলাসহ ৭৫ জনের একটি দল মক্কায় আসেন এবং আকাবায় মহানবি (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা মহানবি (স) ও সাহাবীদের মদিনায় হিজরতের আহ্বান জানান এবং সব রকম সাহায্য সহযোগিতা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

মক্কার কাফিরদের বিরোধিতা ও নির্যাতনের মাত্রা যখন বেড়ে গেল এবং মক্কায় ইসলাম প্রচার বাঁধাগ্রস্ত হলো, তখন মহানবি (স) সাহাবীগণকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন এবং নিজে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় রইলেন।

সাওর গুহা

কাফেররা দেখলো যে, মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছে। নবি করিম (স) হয়তো এক ফাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন, তাদের শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবি (স) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। এক রাতে তারা নবি করিম (স) –এর ঘর অবরোধ করল এবং প্রত্যুষে তাঁকে হত্যা করার অপেক্ষায় থাকল। আল্লাহ তায়ালা নবিকে কাফেরদের চক্রান্তের কথা জানিয়ে দিলেন এবং মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। হিজরত অর্থ 'দেশ ত্যাগ'। মহানবি (স) হযরত আবু বকর (রা) কে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় রওয়ানা হলেন। গচ্ছিত সম্পদ মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মহানবি (স) হযরত আলী (রা) কে তাঁর ঘরে রেখে যান। কাফেররা ঘরে ঢুকে নবি করিম (স)কে না পেয়ে এবং তাঁর বিছানায় আলীকে দেখতে পেয়ে ক্রোধে অধীর হলো। কিন্তু নবি করিম (স)–এর আমানতদারি দেখে তারা মনে মনে লজ্জিত হলো। মহানবি (স) ও আবু বকর সিদ্দীক (রা) কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মক্কার সাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। কাফেররা তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে একেবারে গুহার মুখে। আবু বকর (রা) গুহার মুখে কাফেরদের গতিবিধি লক্ষ্য করে বিচলিত হলেন। মহানবি (স) বললেন, "আবু বকর! চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন"।

আল্লাহর ওপর মহানবি (স)–এর ছিল গভীর আস্থা ও অটল বিশ্বাস।

তিনদিন গুহায় অবস্থানের পর মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌঁছান। মদিনার আবাল বৃদ্ধ–বনিতা পরম আগ্রহ ও ভালোবাসায় মহানবি (স) কে গ্রহণ করলেন, মদিনার ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। নবিজির হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর মাধ্যমে ইসলাম নতুন গতি ও নতুন শক্তি লাভ করে।

মহানবি (স) মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন। মুহাজির মানে– হিজরতকারী। মক্কা থেকে হিজরত করে যাঁরা মদিনায় যান তাঁদেরকে বলা হয় মুহাজির। আর মুহাজিরদের মদিনায় যাঁরা আশ্রয় ও সাহায্য সহযোগিতা দিলেন, তাঁরা হলেন আনসার। আনসার মানে–সাহায্যকারী। মুসলিম জাতি আজ ভ্রাতৃঘাতী কার্যকলাপ পরিহার করে মদিনার আনসারগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে আসলে আজও বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিণত হতে পারে।

মদিনার সনদ

মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করে একটি আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। এখানে মুহাজির, আনসারসহ সকল মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী–ইহুদি,

খ্রিষ্টান ও অন্যান্য মতাদর্শের লোক একত্রে মিলেমিশে সুখে–শান্তিতে নিরাপদে বাস করবে। তাদের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় থাকবে এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে মদিনার নিরাপত্তা ও নিশ্চিত হবে এই উদ্দেশ্যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এটিই মদিনার সনদ নামে খ্যাত এবং এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সনদ। এই সনদে ৪৭টি ধারা ছিল। যেমন–

১. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। ধর্মীয় ব্যাপারে কেউ কারও ওপর হস্তক্ষেপ করবে না।

২. সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে এবং সকলে সমান নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে।

৩. কেউ অপরাধ করলে তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে; সে জন্য গোত্র বা সম্প্রদায় দায়ী হবে না।

৪. হত্যা, রক্তারক্তি, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপকর্ম নিষিদ্ধ করা হলো, মদিনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো।

৫. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কেউ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

৬. সম্প্রদ্রায়গুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মহানবি (স) তা মীমাংসা করে দিবেন ইত্যাদি।

মদিনার সনদ হযরত মুহাম্মদ (স)–এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সুন্দর সমাজ গঠনের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। এতে বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় স্বাধীনতা ও আর্থ–সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়।

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ

মক্কার কাফির–মুশরিকরা চেয়েছিল ইসলাম ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে। মদিনায় ইসলামের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে তারা হিংসায় জ্বলে ওঠে। মদিনার ইহুদিরা তাদের প্ররোচিত করছিল। আবার আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার গুজব উঠেছিল।

কাফেররা মদিনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হলো। সংবাদ পেয়ে রাসুল (স) ৩১৩ জন সাহাবিসহ মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে উপস্থিত হন। দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমযান/ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ বদর প্রান্তরে দুই পক্ষ পরস্পর মুখোমুখী হলো। কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা এক হাজার। অস্ত্রশস্ত্র বেশুমার। মুসলিমদের সংখ্যা নগণ্য। অস্ত্রশস্ত্র তেমন কিছু নেই। কিন্তু তাঁরা ইমানের বলে বলীয়ান। তাঁদের আল্লাহর ওপর অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভরসা। তুমুল যুদ্ধ হলো। মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হলো।

বদর যুদ্ধে কুরাইশ নেতা আবু জাহল, ওলীদ, উৎবা ও শায়বাসহ ৭০ জন মারা যায় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলিম পক্ষে ১৪ জন শহিদ হন, কেউ বন্দী হন নি। রাসুল (স) ও মুসলিমগণ যুদ্ধ বন্দীদের সাথে উদার ও মানবিক আচরণ করেছিলেন। নিজেরা না খেয়ে বন্দীদের খাওয়াতেন। নিজেরা পায়ে হেঁটে বন্দীদের বাহনের ব্যবস্থা করতেন। বন্দী মুক্তির চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষিত বন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০ জন করে নিরক্ষর মুসলিম বালক-বালিকাদের শিক্ষিত করা। এটি শিক্ষাবিস্তারে রসুল (স)-এর প্রচেষ্টারই অংশ। এ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্বল্পসংখ্যক মুসলিম বাহিনীর হাতে কাফেরদের বিরাট বাহিনী পরাজিত হয়। এতে কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

ওহুদ পাহাড়

বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পরেও কাফেররা দমে গেল না। তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বারবার আক্রমণ চালাতে লাগলো। এরমধ্যে ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ ছিল ভয়াবহ। এসব যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হলেও ওহুদ যুদ্ধে সামান্য ভুলের জন্য মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। ৭০ জন সাহাবা শাহাদত বরণ করেন। মহানবি (স)-এর পবিত্র দাঁত ভেঙে যায়।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরী ৬ সনে (৬২৮ খ্রিস্টাব্দে) রাসুল (স) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে ১৪০০ জন সাহাবিসহ মক্কা যাত্রা করেন এবং মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে উপনীত হন। কুরাইশরা উমরা পালনে বাধা দেয়। রাসুল (স) জানালেন আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি, শুধু উমরা করেই চলে যাব। কিন্তু কুরাইশরা তাতেও রাজি হলো না। রাসুল (স) মক্কাবাসীদের কাছে উসমান (রা) কে দূত হিসেবে পাঠান। তাঁর ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি শহিদ হয়েছেন বলে রব ওঠে। রাসুল (স) মুসলমানদের থেকে এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেন। কাফেররা ভীত হয়ে উসমান (রা) কে ফেরত দেয় এবং সুহাইল আমরকে সন্ধির প্রস্তাবসহ পাঠায়। দশ বছরের জন্য সন্ধি হয়। এটিই হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

সন্ধির শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম শর্ত ছিল:

১. মুসলমানগণ এ বছর উমরা না করেই ফিরে যাবেন, আগামী বছর নিরস্ত্র ভাবে ৩ দিনের জন্য আসবেন,

২. কোনো মক্কাবাসী মদিনায় আশ্রয় নিলে তাকে মক্কায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন, কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মক্কায় আসলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। আরবের যে কোনো গোত্র দুপক্ষের যে কারো সাথে মিত্রতা করতে পারবে ইত্যাদি।

আপাতদৃষ্টিতে এই সন্ধির শর্তগুলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সুফল বয়ে এনেছিল। এতে কাফেররা মুসলমানদের একটি শক্তিধর স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মেনে নেয়। দেশ-বিদেশে ইসলাম প্রচারের সুযোগ হয়। দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। একে কুরআনে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলা হয়েছে।

মক্কা বিজয়

কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনু বকর হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলমানদের মিত্র খুযআ গোত্রকে আক্রমণ করে, তাদের মালামাল লুট করে এবং অনেককে আহত ও নিহত করে। রাসুল (স)-এর শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ না করে তারা সন্ধি বাতিল করে।

৮ম হিজরির রমযান মাসে মহানবি (স) দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন। হঠাৎ এতো বড় মুসলিম বাহিনী দেখে কুরাইশরা ভয় পেয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান মহানবি (স) কে মক্কায় স্বাগত জানায়। মহানবি (স) প্রায় বিনাবাধায় একেবারে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন।

ক্ষমা

যে মক্কাবাসী একদিন মহানবি (স) ও মুসলমানদের নির্মম নির্যাতন করেছিল, মহানবি (স) কে হত্যা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, যাঁকে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। মদীনায়ও তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সেই মক্কায় আজ তিনি বিজয়ীর বেশে। তিনি এখন মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি। আর মক্কাবাসী তাঁর সামনে অপরাধির বেশে দণ্ডায়মান।

মহানবি (স) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা আমার কাছে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করছ?"

তারা বলল, "আজ আপনি আমাদের যে কোনো শাস্তি দিতে পারেন, তবে আপনি তো আমাদের দয়ালু ভাই ও দয়ালু ভাইয়ের পুত্র, আপনার কাছে আমরা দয়াপূর্ণ ব্যবহারই প্রত্যাশা করছি।"

রাসুল (স) বললেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।"

মহানবি (স) সবাইকে ক্ষমা করেছিলেন। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকেও ক্ষমা করেছিলেন। এই আবু সুফিয়ান উহুদ যুদ্ধে কাফেরদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এতে মহানবি (স)-এর দাঁত শহিদ হয়েছিল। তাঁর প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রা) শহিদ

হয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর কলিজা চর্বন করেছিল। তিনি তাকেও ক্ষমা করেছিলেন। ক্ষমার এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

বিদায় হজ

মহানবি (স) ১০ম হিজরিতে হজ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। তিনি এরপর আর হজ করার সুযোগ পাননি। তাই একে বিদায় হজ বলে।

মহানবি (স) লক্ষাধিক সাহাবিগণকে নিয়ে হজ আদায় করেন। এই হজেই তিনি আরাফাত ময়দানে জাবালে রহমতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত।

এই ভাষণে মহানবি (স) সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। যেমন–

১. সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।

২. আজকের এদিন, এস্থান, এমাস যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের পরস্পরের জানমাল ও ইজ্জত–আবরু পরস্পরের নিকট পবিত্র।

৩. অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তা খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরাবে।

৪. একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দিবে না।

৫. ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সর্বপ্রকার সুদ হারাম করা হলো। সকল সুদের পাওনা বাতিল করা হলো।

৬. নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও তেমন অধিকার আছে।

৭. জাহেলি যুগের সকল কুসংস্কার ও হত্যার প্রতিশোধ বাতিল করা হলো।

৮. আমানতের খিয়ানত করবে না, গুনার কাজ থেকে বিরত থাকবে। মনে রাখবে একদিন সকলকেই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৯. আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী (আল কুরআনে) এবং তাঁর রাসুলের আদর্শরেখে যাচ্ছি, তোমরা এদুটো যতোদিন আঁকড়ে থাকবে, ততোদিন তোমরা বিপথগামী হবে না।

তিনি আরও অনেক মূল্যবান কথা বললেন।

এরপর মহানবি (স) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! তোমার বাণীকে আমি যথাযথভাবে মানুষের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি?"

উপস্থিত লক্ষ জনতা সমস্বরে জবাব দিলেন, "হ্যা, নিশ্চয়ই।"

মহানবি (স) বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।"

এরপর অবতীর্ণ হলো "আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩)

বিদায় হজ থেকে ফেরার পর মহানবি (স) অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে হিজরি একাদশ সালের ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল (স) ইন্তিকাল করেন।

মদিনা শরিফে মসজিদে নববির এক পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। বিশ্বের মুসলমানগণ ভক্তিভরে নবির রওজা জিয়ারত করেন।

মহানবি (স) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। ক্ষমা, উদারতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, দানে, কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, মানবতা ও মহত্ত্বে তিনি ছিলেন সর্বকালের সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

বাংলা উচ্চারণ: লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাতুন। অর্থ "রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আহসাব: ২১)

আমরা মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ মেনে চলব।

কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি–রাসুলগণের নাম:

১ হযরত আদম (আ)
২ হযরত নুহ (আ)
৩ হযরত সালিহ (আ)
৪ হযরত লূত (আ)
৫ হযরত ইদরীস (আ)
৬ হযরত হূদ (আ)
৭ হযরত ইবরাহীম (আ)
৮ হযরত ইসমাঈল (আ)
৯ হযরত ইসহাক (আ)
১০ হযরত ইয়াকুব (আ)
১১ হযরত ইউসুফ (আ)
১২ হযরত শুআইব (আ)
১৩ হযরত দাউদ (আ)
১৪ হযরত সুলাইমান (আ)
১৫ হযরত মূসা ও হারূন (আ)
১৬ হযরত ইলিয়াস (আ)
১৭ হযরত আইয়ুব (আ)
১৮ হযরত ইউনুস (আ)
১৯ হযরত জাকারিয়া (আ)
২০ হযরত ইয়াহিয়া (আ)
২১ হযরত যুলকিফল (আ)
২২ হযরত উযায়র (আ)
২৩ হযরত আলা ইয়াসাআ (আ)
২৪ হযরত ঈসা (আ)
২৫ হযরত মুহাম্মদ (স)

পরিকল্পিত কাজ :

১ কুরআন মজিদে উল্লিখিত ২৫ জন নবি–রাসুলের নামের তালিকা তৈরি করবে।

২ মহানবি (স)–এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন পঙক্তি তৈরি করবে।

হযরত আদম (আ)

আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে মানবদেহ তৈরি করলেন। তাতে আত্মা দিলেন। এরপর এই দেহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ইনিই হলেন পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম (আ)।

আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন: "আদম তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমরা তাঁকে সম্মান জানাও। তাঁর সম্মানে তাঁকে সিজদাহ কর।" সবাই তাঁকে সম্মান দেখাল। তাঁকে

সিজদাহ করল। তবে এই ফেরেশতাদের সাথে ছিল এক জিন। নাম তার আজাজিল। সে আদমকে সিজদাহ করল না। সে বলল: আমি আগুনের তৈরি। আদম মাটির তৈরি। আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি তাকে সম্মান করব না। সিজদাহ করব না। সে আদমকে সিজদাহ করল না।

আজাজিল ছিল অহংকারী। আল্লাহ অহংকারীকে ভালোবাসেন না। আল্লাহ আজাজিলের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। আজাজিল হয়ে গেল শয়তান। নাম হলো তার ইবলিস। ইবলিস আল্লাহর আদেশ অমান্য করার দরুন অভিশপ্ত শয়তান হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ) কে জান্নাতের মধ্যে থাকতে দিলেন। আদম জান্নাতে আরাম–আয়েশ ও সুখ–শান্তিতে থাকতে লাগলেন। কিন্তু এই অফুরন্ত আরাম–আয়েশের মধ্যেও তিনি নিঃসঙ্গ অনুভব করছিলেন। তাই দয়াময় আল্লাহ হযরত আদম (আ)–এর এক সঙ্গিনী বানালেন। নাম তাঁর হাওয়া (আ)।

আল্লাহ তাঁদের বললেন: 'তোমরা উভয়ে জান্নাতে থাক। খুশিমতো পানাহার করো, আরাম–আয়েশ ও আনন্দ উপভোগ করো। কিন্তু সাবধান! কখনও এ গাছটির কাছে যেও না। যদি যাও তাহলে খুবই অন্যায় হবে। দারুণ ক্ষতি হবে।'

হযরত আদম (আ) এবং হযরত হাওয়া (আ) আল্লাহর হুকুম মেনে জান্নাতের মধ্যে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু শয়তান ইবলিস অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পথ খুঁজতে লাগল। সে জান্নাতে প্রবেশ করে তাঁদের ক্ষতি করার ফন্দি আঁটল। অবশেষে একদিন তাঁদের ধোঁকা দিল। ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াতে সক্ষম হলো। তাঁরা ইবলিসের প্ররোচনায় ঐ ফল খেয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করলেন।

আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় আল্লাহ তাঁদের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁদের জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। তাঁদের দুজনকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। তাঁরা পৃথিবীতে এসে নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। অনেক দিন যাবৎ সবসময় কাঁদতে থাকলেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তওবা করতে থাকলেন।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দোয়া কবুল করলেন। তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁদের তওবা কবুল করলেন। তাঁরা পৃথিবীতে নতুন জীবন শুরু করলেন। সুখে–শান্তিতে

বসবাস করতে থাকলেন। তাঁদের সন্তান হলো। পৃথিবী মানুষে ভরে উঠল। শুরু হলো মানবজাতির পথযাত্রা।

হযরত আদম (আ) আল্লাহর তাওহিদে বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন: "তোমাদের ও সারা বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তোমরা শুধু তাঁরই এবাদত করবে। তাঁরই কাছে মাথা নত করবে। তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের শান্তি দেবেন। তোমরা জান্নাত লাভ করবে।

আর যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস না কর। তাঁকে না মান। তাহলে দুঃখ পাবে। কষ্ট পাবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবে। তোমরা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।"

হযরত আদম (আ) ছিলেন প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবি। আমরা সবাই তাঁর বংশধর। আমরা সবাই তাঁর জীবনাদর্শে উৎসাহিত হবো। আমরা ভুল বা অন্যায় করলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব। তওবা করব। আমাদের সন্তানদের ইসলাম শিক্ষায় গড়ে তুলব। আল্লাহর ইবাদত করব। সর্বদা আল্লাহকে খুশি রাখব। তাহলে পৃথিবীতে আমরা সুখ পাব। শান্তি পাব। মৃত্যুর পরও শান্তি পাব। জান্নাত লাভ করব। জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব।

পরিকল্পিত কাজ

শিক্ষার্থীরা হযরত আদম (আ) তাঁর সন্তানদের যে উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন তা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

হযরত নূহ (আ)

হযরত আদম (আ)-এর ইন্তিকালের পর কেটে গেল অনেক বছর। হলো বহুকাল। বেড়ে গেল অনেক মানুষ। আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে গেল আল্লাহকে। লিপ্ত হলো তারা মূর্তি পূজায়। পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার বেড়ে গেল। আরো বৃদ্ধি পেল ঝগড়া-মারামারি। অশান্তি আর অশান্তি । তখন আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়েতের জন্য এক নবি পাঠালেন। এই নবির নাম হযরত নূহ (আ)।

হযরত নূহ (আ) আল্লাহর আদেশে দীর্ঘ সাড়ে নয়'শ বছর পৃথিবীতে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলেন। ভালো কাজ করতে বললেন। মন্দ ও খারাপ কাজ বর্জন করার উপদেশ দিলেন।

তিনি মানুষকে বললেন: "তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আন। এক আল্লাহর ইবাদত কর্ মূর্তিপূজা ত্যাগ কর। ভালো কাজ কর। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। আখিরাতের জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখ।" তাঁর এই দাওয়াতে মাত্র আশি জন নারী–পুরুষ সায় দিল। ইমান আনল। বাকি লোকজন তাঁর কথার গুরুত্ব দিল না। তাঁকে পাগল বলে উপহাস করল। কষ্ট দিতে লাগল। তারা কাফেরই থেকে গেল।

হযরত নূহ (আ) দীর্ঘদিন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেন। অবশেষে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে তোমার দীনের পথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমার কথায় সাড়া দেয় নি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি তাদের ধ্বংস করে দিন।"

আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আ)-এর দোয়া কবুল করলেন। আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন 'কিছুদিনের মধ্যে তাদের ওপর আমার গজব নাজেল হবে। মহাপ্লাবন হবে। আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা তৈরি করতে বললেন। বলে দিলেন, গজবের আভাস দেখা দিলেই ইমানদার লোকজনদের নিয়ে নৌকায় উঠে যাবে। সাথে দরকারি আসবাবপত্রও নেবে।'

হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট নৌকা তৈরি করলেন। আর সবাইকে শোনালেন: আল্লাহর কথা না মানার কারণে ভীষণ আজাব আসবে। সবাইকে হুঁশিয়ার করলেন। কিন্তু লোকজন তাঁর কথা শুনল না। সৎপথে এলো না। তারা হযরত নূহ (আ) কে আরও বেশি বেশি ঠাট্টা উপহাস করতে লাগল। তারা বলতে থাকল: "এ মরুভূমিতে কীভাবে নৌকা ভাসবে?"

অবশেষে সত্যি সত্যি তুফানের আলামত দেখা দিল। মাটি ফুঁড়ে পানি বের হলো। শুরু হলো প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। বন্যা আসল। হযরত নূহ (আ) তাঁর ইমানদার লোকজনসহ নৌকায় আরোহণ করলেন। আরও নিলেন প্রতিটি জীবজন্তুর এক এক জোড়া এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। তিনি নৌকা ছাড়ার আগে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়লেন :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَهَا ـ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম।

অর্থ : আল্লাহর নামে এটি চলবে এবং আল্লাহর নামে এটি থামবে। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

হযরত নূহ (আ)–এর তৈরি নৌকা

পানি বেড়েই চলল, আরও প্রবল হলো ঝড় ও বৃষ্টি। নৌকা সবকিছু নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যেও চলতে লাগল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হলো। মাটি থেকেও প্রবল বেগে পানি উঠল। সবকিছু পানিতে ডুবে গেল। কাফেররা পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল পাহাড় ডুবে গেল। তখন কাফেররা আর যাবে কোথায়? সকলে পানিতে ডুবে মারা গেল। কাফেররা ধ্বংস হলো। এমনকি হযরত নূহ (আ)-এর ছেলে কেনান আল্লাহ ও নবির কথা অমান্য করায় পানিতে ডুবে মারা গেল। কেউ বাঁচতে পারল না।

এদিকে হযরত নুহ (আ) তাঁর দলবলসহ আল্লাহর রহমতে পানির ওপরে নৌকাতে ভাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশে পানি আস্তে আস্তে কমে গেল। নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে থামল। হযরত নূহ (আ) লোকজন, জীবজন্তু ও অন্যান্য সবকিছু নিয়ে নৌকা থেকে নেমে আসলেন। পৃথিবী আগের মতো আবার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। তাঁরা পৃথিবীতে আবার নতুন জীবন শুরু করলেন।

হযরত নূহ (আ) ছিলেন সত্য ও ন্যায় প্রচারে আপোষহীন। প্রচুর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সত্য প্রচার থেকে একটুও পিছু হটেননি। আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

আমরা তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করব। আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য আমরা সারাজীবন পরিশ্রম করব। আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য শত বাধাবিপত্তি আসলেও আমরা পিছু হটব না। আমরা আল্লাহর ইবাদত করব। আর সকলকে আল্লাহর দীন মানার জন্য উৎসাহিত করবো। যদি আমরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হব।

পরিকল্পিত কাজ

হযরত নূহ (আ)-এর জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীরা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

হযরত ইবরাহীম (আ)

প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। ইরাক দেশের বাবেল শহরে এক পুরোহিত পরিবারে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার লোকেরা মূর্তিপূজা করত। মানুষকে প্রতারিত করত। পুরোহিতগণ রাজা-বাদশাহের সহযোগিতায় জনগণের উপর অত্যাচার করত। তারা ভাগ্যের ভালোমন্দ জানার জন্য গণকদের শরণাপন্ন হত। গণকদের প্রতি ছিল তাদের অগাদ বিশ্বাস। তারা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছুর পূজা করত।

হযরত ইবরাহীম (আ) বাল্যকাল থেকেই মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেখলেন, চন্দ্র-সূর্য প্রতিদিন একই দিকে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। মূর্তিতো নিজেদের হাতে গড়া। দেশের বাদশাহ আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। মানুষ কেন এদের

পূজা করবে? এদের কাছে মাথা নত করবে? আমাদের জীবন–মৃত্যু, সুখ–দুঃখ এদের কারো হাতে নেই। আমরা এদেরকে 'রব' বলে স্বীকার করব কেন? বস্তুত আমাদের 'রব' একমাত্র আল্লাহ, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর হাতেই সকলের জীবন–মৃত্যু। আমরা একমাত্র সেই আল্লাহরই ইবাদত করি।

হযরত ইবরাহীম (আ)–এর আমলে সেখানকার বাদশাহ ছিল নমরূদ। নমরূদ ছিল নির্মম অত্যাচারী বাদশাহ। হযরত ইবরাহীম (আ)–এর পিতার নাম ছিল আজর। আজর ছিলেন মূর্তি উপাসক। হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পিতা ও অন্য সবাইকে বোঝালেন মূর্তি পূজা করা ঠিক নয়। কিন্তু তারা মানল না। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বাদশাহ নমরূদের কাছে নালিশ করল। বাদশাহ নমরূদের দরবার থেকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো – হযরত ইবরাহীম (আ) কে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। তাদের এ ভয়াবহ সিদ্ধান্তে তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। আল্লাহর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ) কে মেরে ফেলার জন্য বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল। আর সেই জ্বলন্ত আগুনে তাকে ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহর আদেশে আগুন ঠান্ডা হয়ে গেল। হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রেহাই পেলেন। তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না। কোনো কষ্ট হলো না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বাঁচালেন। তাঁকে রক্ষা করলেন। রাখে আল্লাহ্ মারে কে! আল্লাহ বললেন :

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ۔

" হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও। আরামদায়ক হয়ে যাও।"

হযরত ইবরাহীম (আ) মানুষকে আবার আল্লাহর পথে ডাকা শুরু করলেন। এবারেও তাঁর কথা কেউ শুনল না। বরং তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বদেশ ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে চলে গেলেন। সেখানে তিনি আল্লাহর দীন প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো 'রব' নেই, মাবুদ নেই। তোমরা সকলে আল্লাহর ইবাদত কর। এভাবেই তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত হলো।

হযরত ইবরাহীম (আ)–এর জীবনের শেষ ভাগ। ৮৬ বছর বয়স। আল্লাহর রহমতে তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দু পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) এবং

হযরত ইসহাক (আ) নবি ছিলেন। একদা হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর আদেশে শিশু ইসমাইল ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন দিয়ে আসলেন। জনমানবহীন পাহাড় ঘেরা মরু উপত্যকা মক্কা। আল্লাহর কুদরতে সেখানে পাথর ফেটে পানি বের হলো। সৃষ্টি হলো জমজম কূপ। পানির খবর পেয়ে সেখানে মানুষ বসবাস করতে লাগল। গড়ে উঠল জনবসতি। স্থাপিত হলো মক্কানগরী।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ) কে আদেশ দিলেন : 'তোমার প্রিয় বস্তুকে আমার নামে কুরবানি দাও।' তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্র ইসমাঈল (আ) কে কুরবানি দেবেন। তিনি পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত থেকে এক দুম্বা পাঠালেন। ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল। আল্লাহ এই কুরবানি প্রথা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং পুত্র ইসমাঈল (আ) মিলে এখানেই কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবি। তাঁকে খলিলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু বলা হয়।

কাবা শরিফ

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেসব ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমরাও আমাদের জীবনে সেগুলো বাস্তবায়িত করব।

পরিকল্পিত কাজ :

শিক্ষার্থীরা ইবরাহীম (আ)-এর সময়ের লোকদের কার্যকলাপ খাতায় লিখবে।

হযরত দাউদ (আ)

হযরত দাউদ (আ) বনি ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মেষ চড়াতেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী এবং অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী। তিনি বাদশাহ তালুতের সেনাপতি ছিলেন। তাঁর যুদ্ধ কৌশল ছিল অসাধারণ। তিনি সেনাপতি থাকাকালে আল্লাহদ্রোহী ও অত্যাচারী শাসক জালুতকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেছিলেন। বাদশাহ তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। বাদশাহর মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি রাতে খুব কম ঘুমাতেন। প্রায় সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করতেন। সালাত আদায় করতেন। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতেন। তিনি একদিন পর একদিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করতেন।

তিনি একজন নবি ও রাসুল ছিলেন। তাঁর ওপর প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব 'যাবুর' নাজেল হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন : "দাউদ (আ)-কে আমি যাবুর দান করেছি।"

তিনি আল্লাহর নির্দেশে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। তিনি যাবুর কিতাব তিলাওয়াত করতেন। তাঁর সুমধুর তিলাওয়াত বনের পশু-পাখিরাও শুনত। এমনকি নদী ও সাগরের মাছগুলোও তাঁর তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হতো। তিনি এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আ) পুশপাখিদের ভাষা বুঝতেন। তাদের সাথে কথাবার্তাও বলতে পারতেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তিনি ছিলেন সুশাসক ও সুবিচারক। জনগণ সব সময় তাঁর কাছ থেকে ন্যায় ও সুবিচার পেত। তাঁর বিচারব্যবস্থা ছিল নিখুঁত ও নিরপেক্ষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী। জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি ছদ্মবেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। অলিতে গলিতে ও বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে

দেখতেন। তিনি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থসম্পদ গ্রহণ করতেন না। তিনি আল্লাহর কুদরতে স্বহস্তে ইস্পাতের যেরা বা বর্ম বানাতেন। আর তা বিক্রি করে যা উপার্জন হতো তা দিয়ে নিজের সংসার চালাতেন। তিনি সত্তর বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আমরা হযরত দাউদ (আ)-এর ন্যায় আল্লাহর ইবাদত করব। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করব। সুশাসক হব, জনগণের দুঃখ দুর্দশা মোচন করব। কারো কোনো ক্ষতি করব না। শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করব। সালাত আদায় করব। সাওম পালন করব। আল্লাহকে খুশি রাখব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত দাউদ (আ)-এর ন্যায়বিচার ও সুশাসনের বর্ণনা খাতায় সুন্দর করে লিখবে।

হযরত সুলায়মান (আ)

হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন হযরত দাউদ (আ)–এর পুত্র। তিনি নবি ও বাদশাহ ছিলেন। প্যালেস্টাইনে তাঁর রাজত্ব ছিল। ইসরাইলি বাদশাহগণের মধ্যে ক্ষমতায় ও শান শওকতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

তিনি জিন–পরী, পশু–পাখি, গাছপালার ভাষা বুঝতে পারতেন। আল্লাহর আদেশে এসব তাঁর অধীনে ছিল। এমনকি বাতাসও তাঁর অধীনে ছিল। আর আল্লাহর হুকুমে এসব কিছুই তাঁর নির্দেশ মেনে চলত। আল্লাহর রহমতে যাকে যা নির্দেশ দিতেন সে তা পালন করত। এতো বড় বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না।

তিনি আল্লাহর ইবাদত করতেন। তিনি অনেক ক্ষমতা ও শান–শওকতের মধ্যে থেকেও আল্লাহকে ভুলে যাননি। তিনি বলতেন: "আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরিক নেই। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। কারো ওপর অন্যায়–অত্যাচার করো না। আল্লাহর শাস্তির ভয় করো।" তিনি সুশাসক ও সুবিচারক ছিলেন।

একটি ঘটনা

একদা দুজন স্ত্রীলোকের প্রত্যেকেই একটি শিশুকে তার নিজের বলে দাবি করেন। তারা দুজনে ঝগড়া করতে করতে মীমাংসা করার জন্য হযরত দাউদ (আ)–এর দরবারে

উপস্থিত হন। হযরত দাউদ (আ) তাদের দুজনের বক্তব্য শুনলেন। অতঃপর স্বীয় পুত্র হযরত সুলায়মান (আ) কে এর সুবিচার করে দিতে বললেন। হযরত সুলায়মান (আ) সব কথা শুনে বললেন যে, দুজনই যখন শিশুটিকে তার নিজের বলে দাবি করছে, তখন এই শিশুটিকে দুখন্ড করে উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিৎ। অতঃপর তিনি শিশুটিকে মাটিতে শুইয়ে দুখন্ড করার জন্য তলোয়ারটি উঁচু করলেন। এমন সময় একজন মহিলা চিৎকার দিয়ে বললেন, "আমি শিশুটির মা নই। ঐ মহিলাটি শিশুর মা। আপনি তাকেই শিশুটি দিয়ে দিন। দয়া করে শিশুটিকে কাটবেন না।" তখন সুলায়মান (আ) বিচারের রায়ে বললেন: যে মহিলাটি আমাকে হত্যা করতে বাধা দিয়েছেন, তিনিই সত্যিকারের মা। সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি শিশুটিকে তার আসল মাকে দিয়ে দিলেন। আর নকল মাকে শাস্তি দেওয়া হলো। এটি সুবিচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।

হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহর হুকুমে বৃদ্ধ বয়সে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। তিনি লাঠিতে ভর করে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ কাজ তদারকি করেন। এ অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহটি জীবিত অবস্থায় যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে তাঁর হাতের লাঠিটা ভেঙে যায়। আর তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন সকলে অবাক হয়। এভাবে আল্লাহর হুকুমে তিনি ইন্তিকাল করেন। আমরা আল্লাহর ইবাদত করব। ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হব। আমরা অহংকারী হব না।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত সুলায়মান (আ)–এর সুবিচারের কাহিনীটি খাতায় লিখবে।

হযরত ঈসা (আ)

হযরত ঈসা (আ) ফিলিস্তিনের 'বায়তুল লাহাম' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 'বায়তুল লাহাম' স্থানটি বর্তমানে বেথেলহাম নামে পরিচিত। তাঁর আম্মার নাম হযরত মরিয়ম (আ)। আল্লাহর অসীম কুদরতে পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়ম (আ)–এর গর্ভে হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

মহান আল্লাহর বিশেষ কুদরতে তিনি দোলনায় থাকাকালেই শিশু অবস্থায় কথাবার্তা বলার অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কিছু মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যেমন– তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন। জন্মান্ধকে চোখের দৃষ্টিশক্তি দান করতেন। ধবল, শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগীদের তিনি আল্লাহর রহমতে রোগমুক্ত করে দিতেন।

হযরত ঈসা (আ) ছিলেন আসমানি কিতাব প্রাপ্ত একজন নবি ও রাসুল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর 'ইনজিল' কিতাব নাজেল করেন। সে সময়ে সেখানকার লোকেরা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নানা দেব–দেবীর পূজা করত। হযরত ঈসা (আ) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানালেন। শিরক থেকে বিরত থাকতে বললেন। সকল দুর্নীতি ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে বললেন।

সেখানকার লোকজন হযরত ঈসা (আ)-এর কথা মানল না। তারা আল্লাহর ইবাদত করল না। তারা তাঁর ঘোর শত্রুতে পরিণত হলো। তারা তাঁকে আরো নিষ্ঠুর কষ্ট দিতে থাকল। এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করল। একদিন তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য এক ব্যক্তিকে ঘরের মধ্যে পাঠাল। কিন্তু রাখে আল্লাহ, মারে কে। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতে তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নিলেন। আর ঘরের মধ্যে যে লোকটি তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রবেশ করেছিল, তার আকৃতি হযরত ঈসা (আ)–এর আকৃতির মতো হয়ে গেল। সে ঘর থেকে বের হতেই তার সাথীরা তাকে ঈসা (আ) ভেবে ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করল।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসুল ও বান্দা হযরত ঈসা (আ) কে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে আসমানে নিরাপদে রাখলেন। শেষ জামানায় কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন। মিথ্যাবাদী দাজ্জালকে তিনি হত্যা করবেন। ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। তিনি পৃথিবীতে এসে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স)–এর উম্মত হিসেবে দীন প্রচার করবেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করবেন। আমাদের মহানবি (স)–এর রওজা মুবারকের পাশে তাঁকে দাফন করা হবে।

আমরা হযরত ঈসা (আ) কে নবি–রাসুল বলে স্বীকার করব। আল্লাহর ইবাদত করব। হযরত ঈসা (আ)–এর মোজেযাসমূহ বিশ্বাস করব।

পরিকল্পিত কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত ঈসা (আ)–এর মোজেযাগুলো খাতায় লিখবে।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ?

ক. ৫২২ খ্রি: খ. ৫৭০ খ্রি:

গ. ৬১০ খ্রি: ঘ. ৬২২ খ্রি:।

২. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রথম দুধমাতা কে ছিলেন ?

ক. সোয়েবা খ. হালিমা

গ. আম্বিয়া ঘ. সালেহা।

৩. কত বছর বয়সে মুহাম্মদ (স)-এর দাদা মারা যান ?

ক. ৩ বছর খ. ৫ বছর

গ. ৭ বছর ঘ. ৮ বছর।

৪. নবুয়তের কত সনে মহানবি (স)-এর মিরাজ হয়েছিল?

ক. দশম খ. একাদশ

গ. দ্বাদশ ঘ. চতুর্দশ।

৫. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন ?

ক. ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে খ. ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে

গ. ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে।

৬. হযরত আদম (আ) কিসের তৈরি ?

ক. আগুন খ. পাথর

গ. মাটি ঘ. পানি।

৭. হযরত নুহ (আ) কত বছর আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন ?

ক. সাড়ে ছয় শ বছর খ. সাড়ে নয় শ বছর

গ. সাড়ে আট শ বছর ঘ. সাড়ে সাত শ বছর।

৮. হযরত ইবরাহীম (আ)–এর পিতার নাম কী?

ক. আযম　　খ. হাতেম

গ. আজর　　ঘ. আমর।

৯. হযরত দাউদ (আ) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন ?

ক. বানু ইসরাইল　　খ. বানু তামীম

গ. বানু পায়েস　　ঘ. বানু গালিব।

১০. আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ)–এর ওপর কোন কিতাব নাজেল করেন?

ক. কুরআন　　খ. তাওরাত

গ. ইনজিল　　ঘ. যাবুর ।

১১. হযরত সুলায়মান (আ)–এর পিতার নাম কী?

ক. হযরত ঈসা (আ)　　খ. হযরত দাউদ (আ)

গ. হযরত মূসা (আ)　　ঘ. হযরত ইবরাহীম (আ)।

খ. শূন্যস্থান পূরণ কর

১. হযরত মুহাম্মদ (স) ——— বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

২. ফিকার ——— গোত্র কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

৩. ——— পর্বতের গুহায় হযরত মুহাম্মদ (স) ধ্যান মগ্ন থাকতেন।

৪. হিজরতের সময় মহানবি (স) ——— পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন।

৫. মদিনা সনদে ——— টি ধারা ছিল।

৬. আল্লাহর কোন ——— নেই।

৭. হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট ——— তৈরি করলেন।

৮. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমলে সেখানকার বাদশাহ ছিলেন ———।

৯. হযরত দাউদ (আ) শৈশবে ——— চরাতেন।

১০ হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে ——— করতেন।

গ. বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলো মিলাও

বাম পাশ	ডান পাশ
মহানবি (স)–এর পিতা	আব্দুল মুত্তালিব
মহানবি (স)– এর মাতা	হালিমা
মহানবি (স) –এর দাদা	আবু তালিব
মহানবি (স) –এর চাচা	আব্দুল্লাহ
মহানবি (স)–এর দুধমা	আমিনা
হযরত আদম (আ)–এর সঙ্গির নাম	থামল
নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে	হযরত মরিয়ম (আ)
হযরত দাউদ (আ) বাদশাহ তালুতের	হযরত হাওয়া (আ)
হযরত ঈশা (আ) এর আম্মার নাম	সেনাপতি ছিলেন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১. পাদ্রি বহীরা হযরত মুহাম্মদ (স) সম্বন্ধে কী মন্তব্য করেছিলেন?
২. হযরত মুহাম্মদ(স)–এর গঠিত সংঘের নাম কী?
৩. হাজরে আসওয়াদ কোথায় স্থাপন করা হয়েছিল?
৪. মহানবি (স) প্রথমে কাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন?
৫. আনসার কারা?
৬. মুহাজির কাদের বলে?
৭. বদর যুদ্ধের কারণ কী?
৮. মদিনার সনদ কী?
৯. হুদাইবিয়ার সন্ধি কী?
১০. বিদায় হজ কাকে বলে?
১১. পৃথিবীর আদি মানব কে ছিলেন?
১২. হযরত নূহ (আ)–এর সময় কী আজাব এসেছিল?
১৩. ইবরাহীম (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
১৪. হযরত দাউদ (আ)–এর ওপর কোন কিতাব নাজেল হয়?
১৫. হযরত দাউদ (আ)–এর বীরত্বের উদাহরণ দাও।

১৬. হযরত ঈসা (আ)– এর মোজেযা উল্লেখ কর।
১৭. হযরত ঈসা (আ) বর্তমানে কোথায় জীবিত আছেন?
১৮. আল্লাহর হুকুমে হযরত সুলায়মান (আ)–এর অধীনে কী কী ছিল?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর জন্ম ও বংশ পরিচয় দাও।
২. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল?
৩. শান্তি সংঘের উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
৪. হযরত মুহাম্মদ (স)–এর নবুয়ত লাভের ঘটনা সংক্ষেপে লেখ।
৫. নবুয়ত লাভের পর মহানবি (স) কী কী শিক্ষা দিলেন?
৬. মদিনার সনদ কী? এর কয়েকটি ধারা উল্লেখ কর।
৭. বদর যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।
৮. মক্কা বিজয় ও রাসুল (স)–এর অপূর্ব ক্ষমার দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর।
৯. বিদায় হজে মহানবি (স) যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে লেখ।
১০. কুরআন মজিদে উল্লিখিত ১০ জন নবির নাম লেখ।
১১. আল্লাহ ফেরেশতাদের কী আদেশ দিলেন?
১২. হযরত নূহ (আ) মানুষকে কী কী বললেন?
১৩. হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ডে কীভাবে অক্ষত থাকেন?
১৪. হযরত দাউদ (আ)–এর ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসন সম্পর্কে লেখ।
১৫. হযরত ঈসা (আ) সেখানকার লোকদের কী কী উপদেশ দিলেন?

সমাপ্ত

২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৫-ইস

তোমরা একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ করো না

(আল–কুরআন)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত– বিক্রয়ের জন্য নয়।